হইয়া সংসারোপযোগী কার্য্য সকল শিখাইতে অধীর হইয়া তাহাদের সুখের খেলার প্রতিবন্ধক হইয়া থাকেন। তখন হইতেই সংসারের কঠোর শাসন আরম্ভ হয়। পিতামাতার কাছে বালিকাগণ যে প্রকার আদর যত্ন পায় অল্পদিন মধ্যেই বিবাহ দ্বারা তাহার নিঃশেষ হয়। অনেকের ভাগ্যে বিবাহের পর পুনরাগমন পর্য্যন্ত ঘটে না। বড়লোকদের মধ্যে বিবাহের পর বধূকে পিত্রালয় পাঠান এক প্রকার নিয়ম বিরুদ্ধ, কেবল মধ্যবিত্ত ও নীচ শ্রেণীতেই সেই নিয়ম আছে। এমন শিশু বালিকার পক্ষে পিতামাতার স্নেহ যত্ন ত্যাগ করিয়া নিতান্ত অপরিচিত পরের নিকট বাস করা কিপ্রকার ক্লেশকর তাহা সহজেই বুঝা যায়। তাহাতে আবার অনেকের ভাগ্যেই ভাল শ্বশুর শাশুড়ী ঘটে না. সামান্য ত্রুটিতে তিলে তাল করিয়া অজস্র বাক্যবাণ বর্ষণ করিতে তাঁহারা ত্রুটি করেন না। কথায় কথায় আদুরে মেয়ে বলিয়া বালিকা তিরস্কৃত হয়। বালিকা-সুলভ চপলতা বশতঃ একটি সামান্য দোষ করিলেও ক্ষমা করা দূরে থাকুক, পাড়া প্রতিবাসীর নিকট বধূর দোষ সকল প্রচার করিয়া শাশুড়ী ও ননদগণ সাধ্যমত কষ্ট প্রদান করিয়া থাকে। পিতৃগৃহে বালিকাগণ কত যত্ন ও আদরে লালিত পালিত হয়, আদর যত্ন ভিন্ন কষ্ট কাহাকে বলে জানে না ; এমন কি, কোন কোন বালিকা পিতামাতার একমাত্র কন্যা নয়নের মণি, অঞ্চলের ধন, বিবাহের পর তাহাদের ভাগ্যে এ প্রকার গঞ্জনা ও লাঞ্ছনা অসহনীয়। এ প্রকার দুর্ব্যবহার দ্বারা বালিকাদিগের

কোমল মন অচিরেই কঠিন হইয়া পড়ে, তাহাদিগের মনের স্ফূর্ত্তি, আগ্রহ ও উৎসাহ ক্রমেই চলিয়া যায়, নিস্তেজ শক্তিহীন দেহ, যন্ত্রের ন্যায় সংসারে গুরুলোকের আদেশ পালনে দিনরাত ব্যস্ত থাকে। কেবল ভয় পাছে কোন কাজের ত্রুটি হইলে লঘু পাপে গুরুদণ্ড পাইতে হইবে। অল্প বুদ্ধি বালিকা আপন পর জ্ঞানের অভাবে সরলভাবে মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া ফেলে, জানে না কখন কে কোন কথার কূট অর্থ করিয়া বাক্যবাণে হৃদয় বিদীর্ণ করিবে।

এ প্রকার জীবন বহন সংসারে কেবলই বিড়ম্বনা। স্বামীর পরিজনগণ হইতে মিষ্টবাক্য ও স্নেহ ব্যবহারের পরিবর্ত্তে বধূগণ প্রায়শঃ নির্য্যাতন ও দুর্ব্ব্যবহার সহ্য করিয়া থাকে তাহা কাহারো অবিদিত নাই। কোন কোন গৃহে সদ্ব্যবহারও পাইয়া থাকে তাহার সংখ্যা অতি অল্প। এত অল্প বয়সে পিতামাতার স্নেহ ক্রোড় ছাড়িয়া নিতান্ত অপরিচিতের মধ্যে গিয়া বাস করা বালিকার পক্ষে যেমন ক্লেশজনক পিতামাতার পক্ষেও তদপেক্ষা কম নয়। সন্তানের কষ্টে পিতামাতার হৃদয়গ্রন্থি ছিঁড়িয়া যায় কিন্তু তথাপি দেশাচারের কুনিয়মের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এমন সাধ্য কাহারো নাই।

শ্বশুরালয়ে আসিয়াই বালিকাকে সংসারের যাবতীয় কাজ কর্ম্মের ভার ক্রমে গ্রহণ করিতে হয়। তখন শাশুড়ীদিগের বিশ্রামের সময় উপস্থিত হয়। নববধূর প্রতি গৃহকর্ম্মের ভার দিয়া তাঁহারা অবসর গ্রহণ করেন। বিদ্যাহীন কুসংস্কারাপন্ন

স্ত্রালোকদিগের গৃহকর্ম্ম ভিন্ন দিন কাটাইবার অন্য ব্যবস্থা কিছুই নাই তখন সম অবস্থাপন্ন দশজন প্রতিবাসিনীর সহিত গল্প করাই তাহাদের দিনপাতের প্রধান উপায় হয়।

"কার্য্যপটুতার সীমা যাহার রন্ধনে, ভ্রমণের সীমা যার গৃহের প্রাঙ্গনে" সেই বঙ্গনারী আর কি বিষয় লইয়া গল্প করিতে পারে। তখন নববধূর চরিত্রে দোষারোপ ও তাহার নিন্দা গল্পের প্রধান অঙ্গ হইয়া উঠে। অসহায়া কুলবধূদের অযথা নিন্দাবাদে তাঁহাদের বিশেষ উৎসাহ ও আমোদ দেখা যায়, ইহা দ্বারা বধূদিগের যে বিশেষ কষ্ট হয় সে বিষয়ে দৃকপাতও করেন না। এ সকল দৃশ্য জীবনে যিনি একবার দেখিয়াছেন তিনি আর ভুলিতে পারেন নাই।

অনেক মাতা আপনার কন্যার কষ্টে এত যাতনা ভোগ করেন যে তাঁহার প্রাণে আর শান্তি থাকে না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাঁহার পুত্রবধূ যখন ঘরে আসে তখন একেবারে সে সব ভুলিয়া গিয়া উগ্রচণ্ডী রূপধারণ করেন। পরের মেয়ের কষ্টে তখন আর বিন্দুমাত্র দুঃখ হয় না। এ সকল কেবল মূর্খতা ও কুসংস্কারের দোষ তাহা বলা বাহুল্য। ইহাই হিন্দু-পরিবারে বিশেষ অশান্তির কারণ। এই কারণে প্রত্যেক গৃহে বিবাদ বিসংবাদ প্রায় লাগিয়াই থাকে। শাশুড়ীগণ বালিকা-বধূর প্রতি যদি নিজের কন্যার ন্যায় ব্যবহার করিতে পারিতেন তবে সংসার কত সুখের হইত। শিশুদিগের প্রতি ভাল ব্যবহার করিলে তাহারা সহজেই ভাল হয়। নিরন্তর মন্দ

ব্যবহার দেখিলে ও মন্দ বাক্য শুনিলে তাহাদের জীবনের অধঃপতন হইয়া থাকে। কথায় বলে "কাঁচা মাটী যাহা কর তাহাই হয়" মন্দ ব্যবহার ও মন্দ দৃষ্টান্ত শৈশব জীবনের বিশেষ অনিষ্ট সাধন করে।

বিবাহ বন্ধনে সংবদ্ধ হইয়া যাঁহার সহিত চিরজীবন একত্র বাস করিতে হইবে, যিনি সংসারে একমাত্র ভরসার স্থল, যাঁহার উপর সমস্ত জীবনের সুখ দুঃখ নির্ভর করে, এমন কি, যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, বিবাহের পূর্ব্বে তাঁহার সহিত বিন্দুমাত্র পরিচয় হয় না। সুতরাং বিবাহের পর তাহার সহিত কি সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং কি প্রকার ব্যবহার করা উচিত বালিকাগণ তাহা কিছুই বুঝিতে পারে না। সেজন্য অনেক বালিকা স্বামীকে দেখিয়া ভয় পায় ও শত্রু জ্ঞান করে। ইহা দ্বারা সময় সময় বিষময় ফল উৎপন্ন হয়। সকলের ভাগ্যে সৎস্বামী ঘটে না। স্বামী অসচ্চরিত্র ও উদ্ধত-প্রকৃতি হইলে এই বালিকাভাবের কূটঅর্থ করিয়া নিতান্ত অসন্তুষ্ট হয় এবং স্ত্রীর প্রতি দুর্ব্যবহার করিতে ক্রটী করে না। এই সকল স্ত্রীপুরুষ পরস্পরকে বুঝিতে না পারিয়া অসদ্ ব্যবহার ও অসদাচরণ দ্বারা জীবন আরম্ভ করে এবং তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের ফল অতি বিষময় হয়। এদেশের পুরুষদিগের বিবাহের নির্দ্দিষ্ট সময় নাই পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকা অশীতিপর বৃদ্ধের সহিত পরিণীতা হয় বয়সের অধিকতর ন্যূনাধিক্য থাকিলে যথার্থ মিলন হয় না। বালিকার মন সর্ব্বদা খেলায়

ব্যস্ত, সংসারের ভাবনা ভাবিতে জানে না, বৃদ্ধ বিষয় চিন্তা কিম্বা আপনার অন্তিম কালের ভাবনায় মগ্ন থাকে। বালিকা বৃদ্ধের ভাব কিছুই বুঝিতে পারে না, বৃদ্ধও বালিকার ছেলে খেলাতে সন্তুষ্ট হয় না, এমতাবস্থায় পরস্পরের মনের মিলন হওয়া সম্ভবপর নহে। এস্থলে দাম্পত্য প্রেমলাভ ও তদ্দারা সুখের আশা দুরাশা মাত্র। বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে যাইয়া বালিকাদিগকে সংসারের গুরুতরভার বহন করিতে হয়. অনেকেরই আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল হয় না, দাস দাসী রাখিবার ক্ষমতা থাকে না, সাংসারিক কার্য্য প্রায় নিজ হস্তেই সম্পাদন করিতে হয়। কেহ কেহ অল্প সংখ্যক দাস দাসী রাখিয়া সাহায্য লাভও করিয়া থাকে। অনেকেই আবার ১৩।১৪ বৎসর বয়সেই সন্তানবতী হয়। বলিতে গেলে নিজেই শিশু তাহাতে আবার শিশু পালন! শিশু পালন ও সংসার সংরক্ষণ এই দুই গুরুতর ভার মস্তকে পতিত হইয়া তাহাদের কি প্রকার শোচনীয় অবস্থা হয় বলা যায় না। সত্য বটে অনেকেই নিজের সহিষ্ণুতাগুণে সে সকল কষ্ট অম্লানবদনে সহ্য করে, তথাপি শারীরিক নিয়মলঙ্ঘন হেতু যে সকল অনিষ্ট সাধিত হয় তাহার প্রতিবিধান আর কিছুতেই হয় না। এই কারণে অনেক বালিকা সূতিকা রোগগ্রস্ত হয়, অনিয়ম ও অযত্নে তাহা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইয়া অবশেষে প্রাণ সংহারক হয়। বাল্যবিবাহ বাঙ্গালী জাতির উন্নতির প্রতিবন্ধক ও দুর্ব্বলতার অন্যতর কারণ। শিশু বৃক্ষে ফল জন্মিলে যেমন

তাহা অচিরেই শুষ্ক হইয়া মরিয়া যায়। তেমন অপরিণত বয়সে সন্তান জন্মিলে সে সন্তান দীর্ঘায়ুঃ হয় না, অনেকে সূতিকাগৃহেই প্রাণত্যাগ করে, আবার কোন কোন সন্তান চিররুগ্ন হইয়া জননীকে আজীবন কষ্ট প্রদান করে।

অল্পবয়সে সন্তান জন্মিলে মাতা সন্তান পালন বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ থাকে সুতরাং উপযুক্ত যত্নাভাবে অনেক সন্তান অকালে কালের করাল কবলে পতিত হয়। কখন কখন প্রসূতিও সূতিকাগৃহে কিম্বা তাহার কিছুদিন পরে পীড়িত হইয়া বহুকাল রোগ ভোগ করে; কেহ কেহ অচিরেই মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হয়। এ প্রকার হৃদয় বিদারক ঘটনা নিরন্তর ঘটিতেছে তাহা দেখিয়াও লোকের চৈতন্য হয় না ইহা নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়।

বাল্যবিবাহ দ্বারা যে কেবল বালিকাদিগের অনিষ্ট হয় তাহা নহে বালকদিগেরও বিশেষ অমঙ্গল সাধিত হয়। বাল-কেরা নিশ্চিন্ত মনে বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারে না। কাহারো বা অল্প বয়সেই সন্তান জন্মে। তদ্দ্বারা সংসারের নানা প্রকার ঝঞ্ঝাট ও অর্থচিন্তা আসিয়া মনে উপস্থিত হয়। উপার্জ্জনক্ষম হইতে না হইতে, আয়ের পথ বাড়িতে না বাড়িতে ব্যয়ভার মস্তকে পতিত হয়; এমতাবস্থায় তাহাদের উন্নতি দূরের কথা তাহারা দিন দিন অধঃপতনের দিকেই যাইতে থাকে. এ সকল দুর্দ্দশা দেখিয়াও কোন পিতামাতা তাহার প্রতিবিধানে যত্নপর হয়েন না। অনেক পিতামাতা মনে করেন পুত্রবধূ গৃহে

আসিলেই গৃহকর্ম্মের অনেক সাহায্য হইবে। পুত্র বিবাহের কিছুই বুঝে না বিবাহ কেবল নিয়মরক্ষা মাত্র। তাহাদের জানা উচিত যে শিশুহৃদয় প্রেমহীন নহে। প্রেমের বীজ শিশুহৃদয়ে নিহিত রহিয়াছে সময়ে অঙ্কুরিত হইয়া ইহাই ফুলে ফলে সুশোভিত হইতে পারে ও মনোহর গন্ধ বিস্তার করিতে পারে। অকালে বলপূর্ব্বক তাহা ফুটাইতে গেলে সংসারের কীট ভিতরে প্রবেশ করিয়া অচিরেই তাহার বিনাশ সাধন করে। যে বালক অনন্য মনে বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারিলে অনায়াসে মান্যগণ্য ও যশস্বী হইতে পারিত পিতামাতার স্বার্থান্ধতা ও অবিবেচনার জন্য তাহার এ প্রকার সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন বাল্যবিবাহ দ্বারা আরও অনেক অমঙ্গল সাধন হয়। কন্যার বিবাহ পিতার একটী বিপদ বিশেষ; একটী কন্যা সম্প্রদান করিতে যথাসর্ব্বস্ব ব্যয়িত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশকরা কোন ছেলের সহিত বিবাহ দেওয়া আরও অধিকতর ব্যয় সাপেক্ষ।

কন্যাকে ভরি হিসাবে সোণার গহনা ও বরকে নগদ টাকা ও ঘড়ি, চেইন, আংটী প্রভৃতি উচ্চ মূল্যের জিনিস বরপক্ষের ফর্দ্দ অনুসারে দিতে হয়। নতুবা কন্যার পিতার কোন প্রকারে মান থাকে না। এ সকল দানের বিন্দুমাত্র ত্রুটী হইলে উভয় পক্ষের মনোবাদ ঘটে। সুতরাং বিবাহ দ্বারা কোথায় সুখ সঞ্চয় হইবে না উভয় পক্ষের মনান্তর ও অসুখের কারণ হয়। এ কারণে অনেক বালিকা শ্বশুরালয়ে

যাইয়া আদর যত্নের পরিবর্ত্তে নির্য্যাতন ও গঞ্জনা লাভ করিয়া থাকে। এই জঘন্য আচরণ উভয় পক্ষের শান্তি নষ্ট করে অতএব ইহার প্রতিবিধান অতীব প্রয়োজন। বহুকালাবধি পুত্র কন্যার বিবাহে অপরিমিত অর্থব্যয় আমোদজনক মনে করা হয়। কিন্তু ইহা বাস্তবিক সুরুচির পরিচায়ক নহে। দুদিনের সুখের জন্য যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া চিরজীবন কষ্ট পাওয়া নিতান্ত মূর্খতার চিহ্ন; এ প্রকার আমোদকে যথার্থ আমোদ বলা যাইতে পারে না। এ সকল কুনিয়ম যত শীঘ্র দেশ হইতে পলায়ন করে ততই মঙ্গল।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে সকল উন্নতিশীল বিচক্ষণ লোক বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বাগ্রগণ্য তাঁহারা তো সকলেই বাল্য-বিবাহ করিয়াছেন। এতদুত্তরে বলা যাইতে পারে, তাঁহারা ক্ষণজন্মা; অগ্নির তেজ যেমন বসনাবৃত থাকে না তেজস্বী পুরুষের তেজও তেমন অন্ধকার ভেদ করিয়া উঠে, কোন প্রতিবন্ধক মানে না। সে প্রকার পুরুষ শতের মধ্যে একজন মাত্র পাওয়া যায়। সমস্ত ভারত সন্তান যদি তেমন তেজস্বী ও কর্ত্তব্যপরায়ণ হইত তবে আর দুঃখ দরিদ্রতার প্রকোপ এত ভীষণ হইত না।

পরিবারে একজন উপার্জ্জনশীল হইলে সমস্ত পরিবার ও দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় পর্য্যন্ত তাহার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে ইহা দ্বারা কাহারো অর্থসচ্ছলতা হয় না। সত্য বটে বাল্য-বিবাহ ভিন্ন বহুপরিবার একত্র ও একান্নভুক্ত থাকা অসম্ভব।

পূর্ব্বকালে এ নিয়ম দ্বারা পরিবারে কতকটা সুখ ছিল বটে। উপার্জ্জনশীল গৃহস্বামী সমস্ত বৎসর দূরদেশে বাস করিতেন, পত্নীকে পিতামাতার নিকট রাখিতেন, সেকালের নিয়মানুসারে যে বয়সে জ্যেষ্ঠ সেই গৃহের কর্ত্তা আর সকলে তাহার আনুগতা স্বীকার করিত। সমস্ত পরিবারে বিলাসিতার নাম গন্ধ ছিল না। সামান্য অন্নবস্ত্রে সকলেই সন্তুষ্ট থাকিত। অর্থের তত প্রয়োজন ছিল না তাহার অভাবে কাহারো কষ্ট ছিল না। শিশুকাল হইতে বালিকারা বহুপরিবারে চলনোপযোগী শিক্ষা পাইত। বালিকাদিগের চরিত্র যে ভাবে গঠন করা যায় যুবতীদিগের চরিত্র সে প্রকারে কখন গড়া যায় না। ইহা বহুপরিবার একত্র থাকার পক্ষে উপযোগী বটে। কিন্তু সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সকল বিষয়েরই পরিবর্ত্তন ঘটে। এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় শৈশবে পরিণীতা হিন্দু বধূগণ নিরীহ ভাবাপন্ন নহেন। স্থানে স্থানে দেখা যায় তাঁহারাই এক একজন মূর্ত্তিমতী উগ্রচণ্ডী। স্বামীর প্রতি শাসনে তাঁহারাই প্রধান পদলাভের উপযুক্ত। বসনভূষণের বিলাসিতা-বিষয়ে তাহারা আর পশ্চাৎবর্ত্তিনী নহে। স্বামী দশ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিলেই স্ত্রী তাহার সঙ্গিনী হয়, স্বামীর উপার্জ্জিত অর্থ তাহারা অকাতরে পরিবারের লোককে ভোগ করিতে দেয় না। যদি সমস্ত পরিবারের লোক একত্র বাস করে তবে তাহারা কলহ বিবাদে নিরন্তর অশান্তি উৎপাদন করে। এমতাবস্থায় একত্র বাসের ইচ্ছা কেবলই অশান্তির কারণ।

এখন হিন্দুগৃহে আর তেমন একতা নাই। দুঃখের বিষয় এই পূর্ব্বনিয়ম সকল রক্ষাকরিতে গিয়া উপযুক্ত রকম বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারে না যাহা দ্বারা ন্যায় অন্যায় জ্ঞান প্রস্ফুটিত হয় ও কর্ত্তব্য সাধনের সহায়তা করে। ন্যায় অন্যায় বিবেচনা না থাকিলে মানুষ সংসারে যথার্থ কর্ত্তব্যসাধনে সমর্থ হয় না। একত্র থাকিয়া যদি অশান্তি ভোগ করিতে হয় তদপেক্ষা ভিন্ন থাকা অধিকতর শ্রেয়স্কর। প্রত্যেকে যদি আপনাপন পরিবার পালন করা কর্ত্তব্য বলিয়া জানিত তবে অবশ্যই তদুপযোগী হইতে চেষ্টা করিত। পরিবার পালনের ক্ষমতা থাকিলে একত্র থাকিতে যদি অনিচ্ছা হয় তাহাতে দুঃখ কি? যাহাদের কর্ত্তব্য জ্ঞান আছে তাহারা ভিন্ন থাকিয়াও পিতামাতা আত্মীয়স্বজনকে অর্থসাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হয় না। যাহারা নিতান্ত স্বার্থপর তাহারা কোন অবস্থাতেই মুক্তহস্ত নহে। বাল্যবিবাহ দ্বারা পূর্ব্বে পরিবার মধ্যে যে প্রকার সুখ শান্তির আশা করা যাইত বর্ত্তমান সময়ে তাহা পারা যায় না। অতএব এই প্রথা যত শীঘ্র উঠিয়া যায় ততই মঙ্গল। বাল্যবিবাহের অনিষ্ট কারিতা অনেক কৃতবিদ্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝিয়াও বুঝেন না অথবা উপযুক্ত সাহস ও ক্ষমতার অভাবে এই মহাঅমঙ্গলকর মতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারেন না। অনেকে বাক্যে এই মতের নিন্দা করিয়া থাকে কিন্তু কার্য্যকালে আবার তাহারাই পৃষ্ঠভঙ্গ দেয়। কর্ত্তব্যজ্ঞান, দৃঢ়তা ও সাহসের অভাবই ইহার প্রকৃত কারণ। বাল্য-

বিবাহ প্রথা যতদিন এদেশ হইতে দূরীকৃত না হইবে ততদিন বাঙ্গালি জাতির সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের আশা দুরাশা মাত্র। দেশহিতৈষিতার স্বপক্ষে যত কেন সুদীর্ঘ বক্তৃতা হউক না অমঙ্গলের প্রকৃত মূল উৎপাটিত না হইলে তাহা বাতাসের সহিত মিসিয়া যাইবে। বাঙ্গালীর অবস্থা যাহা তাহাই থাকিবে কেবল বৃথা পরিশ্রম সার হইবে। অতএব যাহাতে ইহার সদুপায় হয় সে বিষয়ে সদাশয় ব্যক্তি মাত্রেরই যত্নপর হওয়া উচিত।

বহুবিবাহ।

বাল্যবিবাহের ন্যায় বহুবিবাহ নামে আর একটী জঘন্য ও অনিষ্টকারী প্রথা এদেশে প্রচলিত আছে। ইহা বাল্য-বিবাহ অপেক্ষা কোন অংশে অল্প ক্ষতিজনক নহে। বরং বাল্যবিবাহ দ্বারা সময়ে সুখের আশা করা যায় কিন্তু বহুবিবাহ দ্বারা দাম্পত্য প্রেমের সুখশান্তি সমূলে উৎপাটিত হইয়া থাকে। এদেশে পুরুষদিগের বিবাহের নির্দ্দিষ্ট সময় ও বিশেষ কোন নিয়ম নাই। তাহারা এক স্ত্রী বর্ত্তমানে বহু দারপরিগ্রহ করিতে পারে, তাহাতে সমাজের চক্ষে কোন প্রকার বিশেষ নিন্দা ও নিগ্রহভাজন হইতে হয় না। বরং সময় সময় উৎ-সাহই লাভ করিয়া থাকে। বিবাহ সম্বন্ধ দ্বারা স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে যে যোগসাধন হয়, ঈশ্বরের সেই মঙ্গল বিধি ও গূঢ় অভিপ্রায় তাহারা বুঝিতে পারে না। তাহারা অনেক সময়

সংসারের নীচকার্য্য ও নীচ ভাব সকলের বশবর্ত্তী হইয়াই এই সামাজিক নিয়ম রক্ষা করিয়া থাকে। যে যে কারণে বিবাহ হওয়া উচিত তাহা না বুঝিয়া এইরূপ বিবাহ দ্বারা পশুবৎ আচরণের প্রশ্রয় দেওয়া ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে।

কোন কোন পুরুষ স্ত্রীবিয়োগ কিম্বা অন্যান্য কারণে দুই তিনবারের অধিক বিবাহ করিতে ক্ষান্ত হয় না। পরিবারের লোকেরা এক বধূর প্রতি কোন কারণে অসন্তুষ্ট হইলে, পুত্র কিম্বা ভ্রাতাকে অন্য বিবাহের জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করে। যে বধূ বন্ধ্যা কিম্বা রুগ্না হয় তাহার স্বামীগৃহে বাস একপ্রকার অসম্ভব হয়। এ সকল বিষয়ে পুরুষের মন অতি সহজেই বিচলিত হয়, তাহাদের পুরাতন অপেক্ষা নূতনের প্রতি বেশী অনুরাগ। নারীর প্রেম যেমন অটল, তাহারা সেইরূপ অবিচলিতভাবে নিতান্ত কুষ্মাণ্ড বর্ব্বর পতির প্রতিও অনায়াসে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকিতে পারে পুরুষেরা তাহা পারে না। চিররুগ্ন কিম্বা বন্ধ্যা হওয়া কাহারও ইচ্ছাধীন নহে তাহা সকলেই জানে তথাপি অসহায়া বঙ্গনারী এ সম্বন্ধে কাহারও নিকট হইতে কখনও দয়া বা সুবিচার প্রাপ্ত হয় না। এই সামান্য সামান্য কারণে তাহাদের একমাত্র অবলম্বন, নির্ভরের স্থল, হৃদয়ের ধন পতিকে কাড়িয়া লইয়া অন্যের হৃদয়ে স্থাপন করা হয়। তাহাদের দীর্ঘনিঃশ্বাস ও অশ্রুজল কাহারো হৃদয়ে কৃপার সঞ্চার করে না। সমস্ত কার্য্য শেষ হইয়া গেলে কেহ কেহ তাহাকে সান্ত্বনা দিতে যায়, স্বামীও অন্নবস্ত্রদানে তুষ্ট করিয়া

থাকেন। এ সকল বালিতে জল ঢালার ন্যায় কেবলই বৃথা, অভাগিনীর হৃদয়ের অনল তদ্বারা অধিকতর প্রজ্জ্বলিত হয়। যাহারা ধীর গম্ভীর তাহারা আপন সহিষ্ণুতাগুণে সমস্ত সহিয়া লয়, কিন্তু যাহারা একটুকু উগ্র-প্রকৃতি তাহাদের দ্বারা সমস্ত সংসারে অসহ্য অশান্তির প্রস্রবণ প্রসারিত হয়। পুরুষদিগের এক পত্নী থাকা সত্ত্বে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করার সুখ অধিক দিন স্থায়ী হয় না। তাহাদের জীবন যে কি অশান্তি ও কষ্টে পূর্ণ হয় তাহা বলা যায় না। কেহ কেহ নিজকৃত অন্যায় কাজের জন্য অনুতপ্তও হইয়া থাকেন, কিন্তু সেই অনুতাপে এই গুরুতর পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হয় না। কেহ কেহ উদাসীন ও সর্ব্বত্যাগী হইয়া গৃহ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। এ সকল ঘটনা নিতান্ত বিরল নহে। শান্তিহীন গৃহ বাসের অযোগ্য।

অনেকেই কৌলীন্য প্রথার নাম শুনিয়া থাকিবেন। এই কৌলীন্যপ্রথা দোষে জঘন্য বহুবিবাহ প্রথা কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজের গৃহে গৃহে অশান্তি, অসুখ ও পাপের প্রতিমূর্ত্তিরূপে বিরাজ করিতেছে। মহারাজ বল্লালসেনের সময় হইতে বঙ্গদেশে এই নিয়মের সৃষ্টি হইয়াছে। এই প্রথানুসারে এক পুরুষ বহু স্ত্রী গ্রহণ করিয়া শ্বশুরকুলকে উদ্ধার করিয়া থাকেন এবং অবশেষে ক্রমান্বয়ে বিবাহ করাই তাহাদের জীবনের লক্ষ্য ও কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে। কোন্ কোন্ বংশের পুত্রকন্যার সঙ্গে কোন্ কোন্ বংশের বিবাহ হইবে তাহার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে, তদভাবে বিবাহ বন্ধ হয়। সময় সময় পাত্রাভাবে

অনেক কন্যা আজীবন অবিবাহিতা থাকে। পাত্রের সংখ্যা অল্প হইলে এক পাত্রে বহুকন্যা সমর্পিত হইয়া থাকে। সেই নির্দ্দিষ্ট বংশে পুত্রের জন্ম না হওয়া পর্য্যন্ত কন্যাগণ অবিবাহিতা থাকে। সেই বংশীয় বালকের সঙ্গেও অশীতিপর বৃদ্ধার বিবাহ হয়। এ সকল আচরণকে পাশব ব্যবহার ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে। কথিত আছে একদা শীতকালে একজন কুলীন বরের সঙ্গে বিবাহদানের জন্য এক বিবাহ-সভায় অনেক বিবাহার্থী কন্যাদিগকে উপস্থিত করা হয়। এক একটী করিয়া কন্যা সম্প্রদান করিতে রাত্রি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; তখন শীতে কাতর হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে একটী বৃদ্ধা বরকে সম্বোধন করিয়া বলিল "বাবা! একটী ফুল শুঁকিয়া দে, শীতে যে আর দাঁড়াইতে পারি না।" পিতৃসম্বোধন করাতে সেই বরের সঙ্গে আর কন্যার বিবাহ হইতে পারিল না। এই গল্পটী নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হয় না। যে স্থলে বিবাহ কেবল সামাজিকতা ও লৌকিকতা রক্ষার জন্য, সে স্থলে এ প্রকার ঘটনা ঘটা কিছুই আশ্চর্য্যজনক নহে।

কুলীন ছেলেদের বিবাহ অনেক স্থলেই অর্থাগমের পথ-স্বরূপ একটী ব্যবসা মাত্র। বিবাহের পর তাহারা স্ত্রীর সঙ্গে বাস করে না, অর্থের অনাটন ঘটিলে সময় সময় আসিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া চলিয়া যায়। স্ত্রীগণ চিরদিন পিতা কিম্বা ভ্রাতার গলগ্রহ হইয়া অতিকষ্টে জীবন যাপন করে। কুলীন কন্যাদের অবস্থা অনেকেই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন;

অতএব এসকল অতিরিক্ত বর্ণনা বলিয়া কেহই অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত পর প্রত্যাশী হইয়া থাকা ও কোন প্রকার শারীরিক ও মানসিক সুখের আশা না থাকা, এ প্রকার জীবন যে কি শোচনীয় তাহা বলা যায় না। কুলীনকন্যাগণ পিতা কিম্বা ভ্রাতার গৃহে কঠিন পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, কিন্তু কিছুতেই তাহাদের স্বত্ব নাই, আমার বলিবার কিছু নাই; নিরন্তর গৃহবাসী বলিয়া পিতামাতা ভ্রাতার স্নেহও ক্রমে হ্রাস হয়, তাহারাও গলগ্রহ মনে করে। আর বিবাহ সত্ত্বেও স্বামীর ভালবাসা, স্বামী হইতে আদর যত্ন প্রভৃতি কিছুই লাভ করিতে পারে না; স্ত্রীজীবনের যাহা যাহা প্রধান সুখ তাহা কেবল তাহাদের কল্পনাই রহিয়া যায়। এ প্রকার শোচনীয় অবস্থা কোন দেশে কোন জাতিতে ঘটে না। ইহাদিগের দুঃখের কথা ভাবিলে পাষাণও দ্রব হয়। অজ্ঞ স্বার্থপর লোকেরা সেই জঘন্য প্রথারই আবার কত গৌরব করিয়া থাকে। সদর্পে আপনাদের কৌলীন্যের পরিচয় প্রদান করে। এই প্রথা নিতান্ত জঘন্য, ইহা একেবারে সমূলে উৎপাটিত হওয়া উচিত। উন্নতিশীল যুবকগণ এ বিষয়ে যথার্থ উৎসাহী না হইলে এ অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তনের অন্য কোন উপায় নাই। যতদিন এই অনাথা স্ত্রীলোকদিগের আর্ত্তনাদ ও ক্রন্দনধ্বনি তাহাদের কর্ণে প্রবেশ না করিবে ততদিন উদ্ধারের উপায় আর নাই।

বিধবাবিবাহ।

হিন্দুসমাজে ভদ্র পরিবারে পুরুষেরা এক স্ত্রী বর্ত্তমানেই হউক আর অবর্ত্তমানেই হউক যদৃচ্ছা ক্রমে বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোকের পক্ষে সে নিয়ম খাটে না। একটি দুই তিন বৎসর বয়স্কা বালিকা অজ্ঞানাবস্থায় পরিণীতা হইয়া যদি বৎসরের মধ্যেই বিধবা হয়, তাহার পুনর্ব্বিবাহের বিধি নাই। তাহার সেই শৈশবাবস্থা হইতে আজীবন কঠোর ব্রত নিয়ম পালনে অতিবাহিত করিতে হয়। পরিধানে শুভ্রবসন, দিনান্তে হবিষ্যান্ন ভক্ষণ, এই বিধি তাহাদের চিরজীবনের জন্য নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। ভাল খাওয়া ভাল পরা সেই দিন হইতে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হয়। একটী জ্ঞান হীনা বালিকা যাহার বিবাহ কিম্বা বৈধব্য ইহার কোন বিষয়ে জ্ঞান জন্মে নাই, স্বামীকে চিনে নাই, প্রেম কি পদার্থ জানে না, সামাজিক নিয়মানুসারে পতি পত্নী নাম মাত্র গ্রহণ করিয়াছে; পতির মৃত্যুর পর সেই অজ্ঞান শিশু বালিকাকে সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়া শুভ্রবসন পরিধান পূর্ব্বক দিনান্তে একবার হবিষ্যান্ন দ্বারা জীবন যাপন করিতে হয়, ইহা কি সামান্য কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারের কর্ম্ম?

যে সকল বালিকা নিতান্ত শৈশবাবস্থায় বিধবা হয় তাহাদের স্বামীর প্রতি অনুরাগ কি প্রকারে জন্মিতে পারে?

অথবা অনুরাগ ভিন্ন ত্যাগ স্বীকার কে কোথায় দেখিয়াছে? পরস্পরকে ভালবাসিলে অনায়াসেই তাহার জন্য ত্যাগস্বীকার করা যায়। সমাজ বলপূর্ব্বক এ প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে শিক্ষা দেয়, প্রকৃত পক্ষে ইহাদ্বারা সমাজের অমঙ্গল ভিন্ন মঙ্গল হয় না। একটী কোমল বালিকার বৈধব্য ও কঠোর ব্রত পালন দ্বারা পিতামাতা প্রভৃতি প্রায় সমস্ত পরিবারের শান্তি নষ্ট হয়। সকলেই ভাল খাওয়া ভাল পরা সম্বন্ধে উদাসীন হয়, তাহা দ্বারা বালিকার যদিও বিশেষ কিছু উপকার হয় না, পরিবারের লোকের অনেক কষ্ট হয়। বালিকাদিগের জন্য এ প্রকার কঠোর নিয়ম করা অতিশয় হৃদয় হীন মনুষ্যের কার্য্য। বিধবাদিগের জন্য মাসে দুইবার একাদশী তিথিতে নির্জ্জলা উপবাসের নিয়ম আছে, এই নিয়ম বালিকা যুবতী বৃদ্ধা সকলকেই সমভাবে রক্ষা করিতে হয়। আহার ও জলাভাবে পিতামাতা ও আত্মীয়দিগের নিকট করুণ স্বরে ক্রন্দন করিয়া একবিন্দু জল চাহিলে দেশাচারের ভয়ে কেহ দেয় না। সকলেই দেশাচারের জঘন্য প্রথার বশীভূত, নতুবা এমন নির্দ্দয়তা ও কাঠিন্য প্রকাশে সমর্থ হইত না। পিতামাতা তাহাদের প্রতি দয়া করিয়া কষ্ট নিবারণ করিতে পারে না, আত্মীয় স্বজন আসিয়া সহানুভূতি দেখায় না। পাড়া প্রতিবাসী এ অবস্থায় মৃত্যু হইলে স্বর্গবাস হয় বলিয়া উৎসাহ দেয়, তাহাদের কষ্ট নিরারণের জন্য কেহই যত্ন করে না। যে দেশে অজ্ঞান অবলা বালিকাদিগের জন্য এ প্রকার কঠোর

নিয়ম স্থাপিত হইয়াছে সে দেশের লোকদিগকে হৃদয় শূন্য পাষণ্ড বই আর কি আর কি বলা যাইতে পারে। তাহারা পুণ্যেরভান করিয়া নিঃসন্দেহ পাপ সঞ্চয় করিয়া থাকে।

কয়েকবৎসর পূর্ব্বে বিধবাদিগের জন্য সহমরণ নামে আর একটী হৃদয় বিদারক কঠোর নিয়ম প্রবর্ত্তিত ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী, স্বামীর মৃতদেহের সহিত একত্র অগ্নিকুণ্ডে ভস্মী-ভূত হইত। সমাজের লোক তাহাকে সতী বলিয়া ধন্য ধন্য করিত। অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগকে প্রস্তুত হওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান তাহার একটী অন্যতর উদ্দেশ্য ছিল। যদি কোন অবলা ভয়ে ভীত হইয়া সহমরণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিত, তাহাকে ধর্ম্মভয় দেখাইয়া অথবা নানা প্রকার উৎসাহ বাক্যে অগ্রসর করিত; তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে কখনও বা বল প্রয়োগ করিত। পরিণত বয়স্কাদিগের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক, কারণ হইতে পারে পতির প্রতি তাহারা যথার্থই অনুরক্তছিল, ও তজ্জন্য এ প্রকার আত্মসমর্পণ করিলেও করিতে পারে, কিন্তু বালিকাদিগের পক্ষে এরূপ ত্যাগস্বীকার সম্ভবপর নহে। এ সকল ভয়ঙ্কর অত্যাচারের কথাশুনিলে কাহার প্রাণ না আকুল হয়। এই পৈশাচিক দেশাচারের প্রতি কাহারও অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা না হইয়া পারে না। সৌভাগ্য ক্রমে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিং সে সময় গবর্ণরজেনারেল হইয়া আসেন তাঁহার ঐকান্তিক যত্ন ও অধ্যবসায় দ্বারা এই জঘন্য নিয়মের পরিবর্ত্তন হয়। রাজা রামমোহন রায় তাঁহার এই

কার্য্যের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। এই মহৎ কার্য্যের জন্য উভয়েই বিশেষ ধন্যবাদার্হ। উপযুক্ত সময়ে উক্ত মহাত্মা-দ্বয়ের আবির্ভাব না হইলে এই ভয়ঙ্কর নিয়ম এখন পর্য্যন্তও এদেশ হইতে বিদূরিত হইত কিনা সন্দেহ স্থল। বিধবাদিগের প্রতি আজ পর্য্যন্তও সমাজের অতিরিক্ত শাসন রহিয়াছে। তদ্দ্বারা সর্ব্বদাই যে মন্দ ফল উৎপন্ন হইতেছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। স্ত্রী বিয়োগে অচিরেই পুরুষদিগের পুনর্ব্বিবাহের আয়োজন করা হয়; যত কঠোরতা কেবল স্ত্রীলোককেই সহিতে হয়। এ সকল পুরুষ জাতির স্বার্থ পরতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ভিন্ন আর কিছুই নহে। কেবল স্ত্রী জাতিকেই আত্মসংযম ও ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা না দিয়া অন্ততঃ কথঞ্চিৎ পরিমাণে নিজেরাও করিতে পারিলে যথার্থ সাধুতার কার্য্য হইত। দুর্ব্বলের প্রতি বলপ্রয়োগ অনায়াসেই করা যায়, ইহাদ্বারা কিছু মহত্ত্ব প্রকাশ পায় না।

মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই সকল বালবিধবাদিগের দুঃখে বিগলিত হইয়া তাহা মোচনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার যত্ন ও সাহায্যে অনেক বিধবা পুনর্ব্বার বিবাহিত হইয়া পতি পুত্র লইয়া সংসারী ও সুখী হইয়াছে। অনেকেই অবগত আছেন যে এই মত প্রবর্ত্তিত করিতে প্রথমতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অনেক যত্ন ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, সমাজ কর্ত্তৃক যথেষ্ট গঞ্জনা ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। দেশস্থ সমস্ত লোকের বিরুদ্ধে

এরূপ একটা কার্য্যে অগ্রসর হওয়া সামান্য সাহস, দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের কার্য্য নহে। তিনি ঐকান্তিক যত্ন ও অধ্যবসায় দ্বারা সম্পূর্ণ কৃতকার্য্যতা লাভে সমর্থ হইয়া অসহায়া বিধবা ও তাহাদের আত্মীয় বর্গের বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়া গিয়াছেন। এই নিয়ম কেবল কলিকাতা ও তাহার নিকটবর্ত্তী প্রদেশে কিয়ৎপরিমাণে প্রচলিত হইয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহ প্রথা এখনও প্রবর্ত্তিত হয় নাই। মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আর কিছু কাল বাঁচিয়া থাকিলে হয়ত সেদেশেও এই প্রথা প্রচলিত হইত।

বর্ত্তমান সময়ে অনেকে বলিয়া থাকেন বিধবা বালিকাদের পুনর্ব্বিবাহে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু যে সকল বিধবার সন্তান থাকে তাহাদের পুনর্ব্বার বিবাহ হওয়া অত্যন্ত অন্যায়। পূর্ব্বপক্ষের সন্তান থাকিলে স্ত্রীলোকের বিবাহ যদি অন্যায় হয় তবে পুরুষের দুই তিন পক্ষের সন্তান লইয়া পুনঃ পুনঃ বিবাহ করা কি প্রকারে ন্যায় সঙ্গত হইতে পারে! ধর্ম্মতঃ একবারের অধিক বিবাহ করিলে যথার্থ পবিত্রতা রক্ষা হয় না, পাপ সঞ্চয় হয়। পাপের ফল স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই সমান ভাবে ভোগ করে। যতবার ইচ্ছা বিবাহ দ্বারা পুরুষের কোন দোষ বা পাপ হয় না স্ত্রীলোকেরাই সকল পাপের ফলভোগী; এ প্রকার বিচার যে স্বার্থপরতার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত তাহা বলাই বাহুল্য। বার বার বিবাহে পুরুষদিগের শরীর ও মনে যদি পাপস্পর্শ না করে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলে স্ত্রীলোক নরক-

গামী হইবে, ইহা বিশ্বাস যোগ্য হইতে পারে না। পরমেশ্বর স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সমভাবে প্রতি-পালন করিতেছেন; যত পুণ্য সঞ্চয় পুরুষের জন্য কেবল পাপ সঞ্চয় স্ত্রীলোকের জন্য, তাঁহার এ প্রকার বিধান হইতেই পারে না। তিনি স্ত্রী ও পুরুষকে সমান অধিকার দিয়াছেন, তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিয়া স্বার্থসাধন করিলে কাহারও পুণ্য লাভ হয় না। পূর্ব্বপক্ষের সন্তান থাকিতে পুনর্ব্বার বিবাহ করিলে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় পক্ষেরই কিয়ৎপরিমাণে অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, সন্তানদিগের ত কথাই নাই। বিমাতা হইতে সন্তানদিগের যে কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় তাহা অনে-কেই জ্ঞাত আছেন। কিন্তু তাহা জানিয়া শুনিয়াও অনেক পুরুষ বিবাহ করিতে ক্ষান্ত থাকে না। বরং এক স্ত্রীর মৃত্যু হইতে না হইতেই অন্য বিবাহের আয়োজন হইয়া থাকে। কুসংস্কারাপন্ন লোকদিগের এরূপ বিশ্বাস যে স্ত্রীর মৃত্যুর দিনেই অন্য বিবাহের প্রস্তাব না হইলে বিবাহের গৌণ হয়; তাই শ্মশান ঘাট হইতে ফিরিতে না ফিরিতেই পুরুষদিগের পুনর্ব্বিবাহের প্রস্তাব হয়। এ সকল হৃদয়হীন পাষণ্ড ব্যব-হারের বিষয় ভাবিলে দেশাচারের কুরীতির উপর কাহার না ঘৃণা হয়? স্ত্রীজাতির প্রতি এদেশীয় লোকের এ প্রকার অশ্র-দ্ধার কারণ কিছু বুঝা যায় না। সম্ভবতঃ পুরুষদিগের প্রভুত্ব ও নিয়ম প্রণয়ণে একচেটিয়া অধিকারই ইহার মূলীভূত কারণ। আরো দুঃখের বিষয় এই যে পরিবারস্থ মূর্খ স্ত্রীলোকেরাই

আবার ইহার বেশী পোষকতা করিয়া থাকে। ইহার একমাত্র কারণ এই দেখা যায়, যেখানে অধীনতা সেখানেই ভয়, সেই ভয় হইতেই তোষামোদী করার ইচ্ছা হয়। স্ত্রীজাতি পুরুষদিগের বিরুদ্ধে একটী কথা কিম্বা কোন প্রকার মতামত প্রকাশে অসমর্থ, তাই তাহারা পুরুষদিগের ইচ্ছা ও কার্য্যে সর্ব্বদাই সহানুভূতি প্রদানে বাধ্য। ইহাই স্ত্রীজাতির অবনতির অন্যতর কারণ। কোন কোন পুরুষের চার পাঁচ বার স্ত্রীবিয়োগ ও বিবাহ দেখা যায়, তন্মধ্যে কেহ কেহ সন্তান রাখিয়াও পরলোক গমন করে। এইরূপে প্রত্যেক স্ত্রীর দুই তিনটী করিয়া সন্তান থাকিলেও এক পরিবারে বহু সংখ্যক সন্তানের একত্র সমাবেশ হয়। যে সকল পুরুষ হিন্দুমতে বিবাহ করে তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া ১১।১২ বৎসরের মেয়েকে বিবাহ করিতে হয়। ১১।১২ বৎসরের বালিকাগণ নিজেই নিজের সতর্কতা লইতে জানে না তাহাতে সপত্নী সন্তানের ভার লইয়া তাহাদিগকে যত্নকরা ও তাহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? এ সকল সন্তানের বিমাতা হইতে স্নেহ যত্ন পাওয়া দূরে থাকুক বরং নানা প্রকার কষ্ট ও লাঞ্ছনা ভোগের ত্রুটী হয় না। তাহাদের কষ্ট ও যন্ত্রণার প্রতি অনেক পিতা দৃষ্টিপাতও করে না। কোন কোন পিতা বিমাতার পক্ষ হইয়া সন্তানের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণও করিয়া থাকে, সে প্রকার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সময় সময় ভাল বিমাতাও হয় কিন্তু সে দৃষ্টান্ত অতি বিরল। যদি পিতামাতার

মনে সন্তানের যথার্থ মঙ্গলেচ্ছা থাকে তাহা হইলে তাহাদের পুনর্ব্বার বিবাহকরা যুক্তি সঙ্গত নহে। ইহাদ্বারা সন্তানের অমঙ্গল সাধনই হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন পুরুষেরা শিশুদিগকে যত্ন করিয়া বাঁচাইতে পারে না এজন্য বিবাহের প্রয়োজন; কিন্তু নবীনামাতা গৃহে আসিয়া তাহাদের অবস্থার কোন উন্নতি না করিয়া বরং অধিকতর কষ্টে নিক্ষেপ করে, সচরাচর ইহাই দেখা যায়। যে পিতা এক সময় দাস দাসী-দিগের প্রতি সন্তানদিগের রক্ষণাবেক্ষণের ভার প্রদানে কুণ্ঠিত হইতেন এবং যথাসাধ্য নিজে তাহাদের পালন করিতেন, বিবাহ করিয়া স্ত্রীর ভরসায় তাহার পূর্ব্বভাব চলিয়া যায়, তখন দাস-দাসীই শিশুদিগের একমাত্র রক্ষক হয়। পিতা ভাবেন গৃহিণী দ্বারাই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। এদিকে সন্তানগণ অধিকতর কষ্ট ভোগ করিতে থাকে। কোন কোন বিমাতার চতুরতার জন্য পিতা তাহাদের কষ্ট কিছুই বুঝিতে পারে না। পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহের পর অধিকাংশ পিতাই সন্তানের প্রতি উদাসীন হয়। যুবতী স্ত্রী গৃহে আসিয়া স্বামীর মন আকর্ষণ করে, সেই মন পূর্ব্ব সন্তানের প্রতি আকৃষ্ট দেখিলে স্ত্রী ক্ষুব্ধা হইয়া সংসারে বিশেষ অশান্তি আনয়ন করে। তখন পুরুষেরা ভাবেন সুখ হইতে স্বস্তি ভাল, তাই অনন্যোপায় হইয়া স্ত্রীর বাধ্যতা স্বীকার করেন। সুতরাং সন্তানগণকে বিমাতার পদতলে পতিত হইয়া, সংসারে অন্ন বস্ত্রের কাঙ্গালী হইয়া, কষ্টে জীবন যাপন করিতে হয়। হিন্দু সমাজে পুরুষেরা

সচরাচর আপন পুত্র কন্যাপেক্ষা বয়সে কনিষ্ঠা বালিকার পাণিগ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। সেস্থলে সপত্নী সন্তানের উপর স্নেহভাব হওয়া মাতার পক্ষে যেমন কঠিন, বয়সে কনিষ্ঠ বিমাতার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা হওয়াও সন্তানের পক্ষে তেমন সহজ নহে। কখন কখন সমবয়স্কা বলিয়া প্রণয় ও সদ্ভাব হইয়া থাকে, সকল স্থানে তাহাও হয় না; অধিকাংশ স্থলেই হিংসা, দ্বেষ, বিরাজ করে। এ প্রকার কষ্ট অশান্তি জানিয়াও কেহ তাঁহার প্রতিবিধানেমনোযোগ করেনা বরং 'ঘরকন্না' চলে না ইত্যাদি ভান করিয়া বিবাহ করিয়া থাকে।

দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে হইলে পুরুষদিগের পক্ষে বিধবা বিবাহই উপযুক্ত, পরস্পরের অবস্থা সমান থাকে, সকল কার্য্যেই উভয়ে উভয়কে সহানুভূতি প্রদান করিতে পারে। উভয় পক্ষের সন্তান থাকিলেও কষ্টের কারণ হয় না। পুরুষ যেমন নিজের সন্তানের যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্নেহময়ী জননীর সাহায্য চায়, স্ত্রীলোকেও আপন সন্তান পালনার্থে অর্থ লাভের প্রয়াসী হয় এবং পুরুষকে অভিভাবক করিয়া অনেক বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়। এ মিলন দ্বারা উভয় পক্ষেরই মঙ্গল হয়। বিধবা রমণীগণ পুনর্বিবাহ সময়ে প্রায়ই বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, এবং সে সময়ে তাহাদের হিতাহিত জ্ঞান প্রায়ই হইয়া থাকে; সপত্নী সন্তানদিগকে ভালবাসিতে পারিবে কিনা তাহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে পারিবে কিনা সে সকল

জানিয়া শুনিয়া তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়া এই গুরুতর ভার মস্তকে ধারণ করিতে পারে। শিশু ও মূর্খ বিমাতা হইতে ইহারা যে অধিক উপযুক্ত তাহার কোন সন্দেহ নাই। তবে হিংসা দ্বেষ সকলেরই মনে থাকে, বয়স্থাদিগের মনে যে থাকে না তাহা বলা যায় না। যাহারা সৎশিক্ষা প্রাপ্ত হয়, যাহাদের মনে জ্ঞানের আলো প্রবেশ করে, যাহাদের কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রস্ফুটিত হয়, তাহারা অবশ্যই অধিকতর উপযুক্ত। বিমাতা ঠিক নিজের মাতার ন্যায় হইবে এ প্রকার মনে করা অন্যায়, কারণ বিশ্বসংসারে মাতার প্রতিরূপ আর কেহ নাই। বুদ্ধিমতী বিমাতা দ্বারা কেবল সাংসারিক অভাব সকল পূরণ হইতে পারে। যাঁহারা হিন্দুসমাজ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগের এ সকল অশান্তি ও অসুবিধা ভোগ অনিবার্য্য। স্ত্রীবিয়োগে পুরুষদিগের যেমন গৃহকার্য্য ও সন্তানপালন চলে না, স্বামীবিয়োগে স্ত্রীলোকের তদপেক্ষাও অধিক কষ্টভোগ করিতে হয়। স্বামীর অবর্ত্তমানে অনেকেরই জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য কোন উপায় থাকে না তাহাদিগকে পিতা কিম্বা ভ্রাতার আশ্রয় ভিন্ন চলে না। পিতার ও ভ্রাতার গৃহে এক পয়সার কাঙ্গালিনী হইয়া সন্তানাদিসহ বাস করা কি প্রকার শোচনীয় অবস্থা একটুকু ভাবিলে সকলেই বুঝিতে পারেন। স্ত্রী বিয়োগে পুরুষদিগের অর্থের অভাব হয় না। অর্থ থাকিলে দাস দাসী দ্বারা সন্তানদিগের রক্ষণাবেক্ষণ ও সংসার কার্য্য এক প্রকার চলিতে পারে। পুরুষেরা স্বাধীনভাবে চলিতে পারে, কোন-

মতে পরের গলগ্রহ হইতে হয় না, সন্তানদিগের ভরণপোষণ জন্য ভাবিতে হয় না। এমতাবস্থায় কেবল পুরুষদেরই বিবাহের আবশ্যক এমন মনে হয় না, অবস্থানুসারে উভয়েরই অভাব সমান তাহার সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে স্ত্রীলোকদের অধিকার নাই বলিলে কেবল পুরুষদিগের স্বার্থপরতা প্রকাশ পায়। বিধবা স্ত্রীলোকের অবস্থা হইতে বিপত্নীক পুরুষের অবস্থা অধিকতর শোচনীয় বলিয়া বোধ হয় না। স্ত্রীও পুরুষদের মধ্যে যাহারা বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হয় তাহাদিগকে বাধা দেওয়া বৃথা, বাধা দিলেও সমুদ্রে বালির বন্ধন যেমন অস্থায়ী হয় ইহার পরিণাম তাহাই ঘটিয়া থাকে। যে স্থলে পুনর্ব্বার বিবাহ অপরিহার্য্য সে স্থলে পূর্ব্ব পক্ষের সন্তানগণের জন্য বিবাহের পূর্ব্বেই বিশেষ একটা বন্দোবস্ত হওয়া আবশ্যক, যাহাতে বিবাহ দ্বারা তাহাদের কষ্ট বর্দ্ধিত না হয়। পত্নীবিয়োগে পতির কিম্বা স্বামীবিয়োগে কোন স্ত্রীর পুনর্ব্বিবাহে বাসনা হইলে সমাজের তাহাতে বাধা দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়। কেন না তাহা দ্বারা নানা প্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা বর্দ্ধিত হইয়া সমাজে বিষময় ফল উৎপন্ন হইতেছে তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন।

বালবিধবাদিগকে পুনঃ পরিণীতা হওয়ায় উপযুক্ত করিতে হইলে গৃহে গৃহে কিম্বা স্বতন্ত্র বিধবা-আশ্রম কি বিধবা-বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে সকল বিষয়ে সুশিক্ষিতা করা উচিত। ঐরূপ ভাবে শিক্ষিতা হওয়ার পরে পুনর্ব্বিবাহ

না হইলেও বিধবারা স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহের পন্থা লাভ করিয়া সুখে শান্তিতে জীবন যাপন করিতে পারে। এই প্রকার দৃষ্টান্ত আজকাল বিরল নহে।

শিক্ষা ও স্বাধীনতা।

বর্ত্তমান সময়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লইয়া শিক্ষিত সমাজে বিশেষ আন্দোলন চলিতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে স্ত্রীজাতির মধ্যে বিদ্যাশিক্ষা ও কোন প্রকার জ্ঞানের চর্চ্চা ছিল না সুতরাং প্রায় সকলেই মূর্খ ও অশিক্ষিতা ছিলেন। লেখাপড়া শিখিলে বিধবা হয় ইত্যাদি অমূলক বাক্য দ্বারা শিশুকাল হইতেই বালিকা দিগকে ভুলাইয়া দিয়া তাহাদের বিদ্যা ও জ্ঞানোপার্জ্জনের পথ রুদ্ধ করা হইত। বিদ্যাশিক্ষার অভাবে শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সাধনে তাঁহারা অসমর্থ ছিলেন। তাহারা সকল বিষয়েই পুরুষদের অধীনা ছিলেন, তাহাদের দ্বারাই অন্ধ ভাবে পরিচালিতা হইতেন। কোন বিষয়ে নিজের কোন মতামত ছিল না। পুরুষদিগের অনুমতি ভিন্ন পদনিক্ষেপের ক্ষমতা ছিল না। স্ত্রী জাতি নিরীহ ভাবে অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃতকরিয়া থাকিবে, শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনের সহিত বাক্যালাপ করিবে না, তাহাদের আজ্ঞা নিরাপত্তিতে পালন করিবে, গৃহকর্ম্ম ও সন্তান পালন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য

বিনা বাক্যব্যয়ে সম্পাদন করিবে। পতিই পরম দেবতা ও পতিসেবাই জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য এই সকল তাহাদিগের বাল্যকালের শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। স্ত্রীজাতি পুরুষ জাতির সুখ সাধনের জন্যই নির্ম্মিত, তাহাদের জীবনের কোন সার নাই, এ বিশ্বাস শৈশবকাল হইতেই তাহাদিগের হৃদয়ে বদ্ধমূল করা হইত। কোন বিষয়ে স্ত্রী জাতির স্বাধীনভাব ছিল না বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানালোচনার অভাবে তাঁহারা নিতান্ত অন্ধ-সংস্কারাপন্না ছিলেন। নিতান্ত সরলা ও পরমুখাপেক্ষী ছিলেন, তাঁহাদের বুদ্ধির প্রখরতা ছিল না, অথবা মার্জ্জনার অভাবে জড়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কোন জটিল বিষয়ে মতামত প্রকাশে অসমর্থ ছিলেন। স্নেহ ও লজ্জাশীলতা স্ত্রীজাতির অঙ্গের ভূষণ, তাহা লইয়া তাঁহারা সংসারে সুখী ছিলেন, স্নেহ দ্বারা সমস্ত পরিবারকে মুগ্ধ রাখিতেন; তাঁহাদের স্বাধীনভাব ছিল না বটে তজ্জন্য কোন কষ্ট ছিল না, স্বাধীন হওয়ার ইচ্ছাও ছিল না। স্বাধীনতা দ্বারা যে কোন প্রকার সুখ হয় সে বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন। স্বাধীনতার নাম শুনিলে তাঁহারা কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিতেন, স্ত্রীলোক স্বাধীন হইলে জাত কুল সব যাবে ইহাই তাঁহাদের ধ্রুব বিশ্বাস ছিল। এজন্য তাহাদের মনে স্বাধীনতার অঙ্কুর হইতে না হইতেই তাহার মূল ছেদন করা হইত। কাহারো বিন্দুমাত্র স্বাধীন ভাব দেখিলে সমাজে নিন্দা ও গঞ্জনার সীমা থাকিত না, সুতরাং সেই ইচ্ছা বর্দ্ধিত হওয়ার কোন সুযোগ পাইত না। মূর্খতা

ও পরাধীনতাকে আপনাদের স্বাভাবিক অবস্থা ভাবিয়া তাহাতেই তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকিতেন, ফলতঃ যাহার যে বিষয়ে অভাব বোধ নাই তাহার তাহা পাইবার আকাঙ্ক্ষা না থাকাই সম্ভব। এস্থলে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে যাহার যে বিষয়ে কষ্ট ও অভাব জ্ঞান নাই, তাহাকে সে অভাব বোধ করাইয়া কি লাভ? এতদুত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে স্ত্রীজাতির অজ্ঞতা ও মূর্খতা দ্বারা জন সমাজের ভূরি ভূরি অমঙ্গল সম্পাদিত হইতেছে। প্রথমতঃ বুদ্ধিমতী মাতা না হইলে বুদ্ধিমান সন্তান প্রায় হয় না, ভাল মাতার ভাল পুত্র হয় ইহা সকলেই বলিয়া থাকে। মাতার অজ্ঞতা প্রযুক্ত শৈশবে সন্তানের উপযুক্ত লালন পালন হয় না, এজন্য অনেক সন্তান সূতিকাগৃহে কিম্বা তাহার অল্পদিন পরেই মরিয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ মাতা নিজে শিক্ষিতা না হওয়াতে শিশুকালে সন্তানগণকে শিক্ষা দিতে পারে না, স্নেহময়ী মাতার প্রতিদিনের অল্প অল্প শিক্ষা দ্বারা সন্তানের শিক্ষা যেমন হৃদয়গ্রাহী হয়, শিক্ষক সে প্রকার শিক্ষা কখন তত সহজে দিতে পারে না। তজ্জন্য মাতার শিক্ষা আরও প্রয়োজনীয়। তৃতীয়তঃ স্বামীর পক্ষেও শিক্ষিতা বুদ্ধিমতী স্ত্রী যেমন সংসারে সহায়তা করিতে পারে, অশিক্ষিতা স্ত্রী কখন তেমন পরে না। গৃহ কর্ম্ম সম্পাদন ও সন্তান পালন এবং দাস দাসী পালন প্রভৃতি কার্য্য শিক্ষিতা রমণীগণ উত্তমরূপে সম্পাদন করিতে পারেন; এ সকল গুরুতর কার্য্যের ভার স্ত্রীর উপর দিয়া পুরুষগণ অনায়াসে অনন্য মনে বিষয়কার্য্য সম্পাদন

করিয়া যশস্বী হইতে পারেন। সত্যবটে রুগ্নাবস্থায় অশিক্ষিতা রমণীগণও স্নেহে বিগলিত হইয়া যত্ন ও শুশ্রূষা করিতে পারেন কিন্তু রোগী কুপথ্য চাহিলে দৃঢ়তার অভাবে অনায়াসে তাহা দিয়া রোগীকে সুখীও করিতে পারেন, কিন্তু তাহার অনিষ্ট-কারিতা উপলব্ধি করিতে পারেন না। একজন শিক্ষিতা বুদ্ধি-মতী স্ত্রী এসকল কার্য্য অত্যন্ত দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিতে পারে। ডাক্তারের অভিপ্রায় ও আদেশমত কার্য্য ঘড়ি দেখিয়া অতি সহজে তাহারা সম্পাদন করিতে পারে, কিন্তু মূর্খ স্ত্রী-লোকের প্রথমতঃ সে সকল বুঝাই অসম্ভব, কার্য্যে পরিণত করা দূরের কথা। এ সকল স্থিরচিত্তে একবার ভাবিলে অশি-ক্ষিতা পরাধীনা স্ত্রী ও শিক্ষিতা স্বাধীনা স্ত্রীর মধ্যে যে কি বিভিন্নতা তাহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। জ্ঞানচর্চ্চা ও স্বাধীনতা দ্বারা মনুষ্যের মনোগত বৃত্তি সকল প্রখরতা প্রাপ্ত হয়, অজ্ঞতা ও অধীনতা দ্বারা সে সকল বৃত্তি ক্রমেই জড়তা লাভ করে। আত্মাতে জ্ঞানের প্রকাশ হইলেই মনুষ্য পরা-ধীনতার কষ্ট আপনা হইতেই অনুভব করে ও আপনাপন ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে ব্যাকুল হয়, জ্ঞানলব্ধ স্বাধীন মত সকল প্রচার করিতে ইচ্ছা হয়; এ সকল মনুষ্যের স্বাভাবিক ইচ্ছা, বর্ত্তমান সময়ে এই সকল ভাবেরই আবির্ভাব দৃষ্ট হইতেছে।

বহুকালাবধি স্ত্রীজাতি অন্তঃপুরে বদ্ধ, স্বাধীনতা শূন্য ও পুরুষদিগের ক্রীড়ার বস্তু মাত্র ছিল। জ্ঞানচর্চ্চার অভাবে

স্ত্রীলোকের মনোমালিন্য দূর হইতে পারে নাই, বংশানুক্রমে একই অবস্থা ভোগ করিয়া আসাতে এবং আপনাদের অবস্থার উন্নতি অবনতি সকল বিষয়েই একান্ত অনভিজ্ঞ থাকাতে তাহারা উন্নতি সাধনে অনিচ্ছুক ছিল; এ বিষয়ে পুরুষগণকে নিতান্ত পশ্চাৎপদ দেখিয়া কোন স্ত্রীলোক অগ্রগামী হইতে পারে নাই। হইতে পারে পুরুষেরা আপনাদিগের ক্ষমতা প্রবল রাখিবার জন্য এই নিয়মের বেশী পক্ষপাতী ছিলেন। স্ত্রীলোকের হীনাবস্থা দ্বারা সমস্ত জাতির হীনাবস্থা ঘটিয়াছে সে সকল তাহাদের বিবেচনার অতীত বিষয় হইয়া রহিয়াছে। পুরুষ যতই কেন জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও উপার্জ্জনশীল হউক না, স্ত্রীই সংসারের ভিত্তি স্বরূপ। কথায় বলে স্ত্রীই গৃহের শ্রী, স্ত্রী হীন গৃহ শ্মশান সমান। একমাত্র স্ত্রীর উপর সংসারের সুখ দুঃখ উন্নতি অবনতি সমুদয় নির্ভর করে, সেই স্ত্রী যদি জ্ঞানহীন ও বিবেচনা শূন্য হয়, তাহা দ্বারা সংসারের কি না দুর্গতি ঘটিতে পারে। অতএব স্ত্রী জাতির বিদ্যোন্নতির অভাব ও অবরোধ প্রথা মনুষ্য সমাজের অবনতির অন্যতর কারণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেহ কেহ বলেন মুসলমান বাদশাহগণ যখন ভারতবর্ষের সিংহাসনারূঢ় ছিলেন, তখন তাঁহারা স্ত্রীজাতির প্রতি অত্যন্ত অসদ্ব্যবহার করিতেন। তাহাদিগের দুরাচারের জন্য স্ত্রীলোকের সতীত্ব রত্ন বিপদসঙ্কুল হইয়া ছিল। যাহার গৃহে সুন্দরী স্ত্রী কিম্বা কন্যা থাকিত তাহারা বলপূর্ব্বক আনিয়া তাহাকে আপনার অন্তঃপুরে রাখিতেন। এ সকল কারণে

স্ত্রীলোকের অবগুণ্ঠন প্রথা প্রচলিত হইয়াছে এবং অন্তঃপুরে পরাধীন ভাবে দিন কর্ত্তনের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহার প্রকৃত সত্য নির্ণয় করা অতীব কঠিন। যে কারণেই হউক বহুকালাবধি অবরোধ প্রথা এদেশে প্রচলিত আছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন।

স্ত্রীলোকের অন্তঃপুরে রুদ্ধ থাকার নিয়ম হিন্দুসমাজ অপেক্ষা মুসলমান সমাজে আরও অধিক প্রবল। তাহারা নিতান্ত শিশু বালিকাদিগকেও অন্তঃপুরের বাহির হইতে দেয় না, নিতান্ত ঘনিষ্ঠ হইলেও পুরুষদিগের সঙ্গে মেয়েরা বাক্যালাপ করিতে পারে না। মুসলমান স্ত্রীলোকেরা পীড়িতাবস্থায় ডাক্তারকেও দেখা দেয় না, পরদার ভিতর হইতে হাত বাহির করিয়া কেবল নাড়ী স্পর্শ করিতে দেয়। তাহাদের অন্তঃপুরের বন্ধন আরো দৃঢ়। মুসলমান স্ত্রীলোকের মধ্যে জ্ঞানের চর্চ্চা আরো কম। ইহাদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে জ্ঞান চর্চ্চা রোধ করা ভিন্ন পরাধীনতার স্থায়িত্ব রক্ষা অতীব কঠিন। পূর্ব্বকালের স্ত্রীলোকেরা মূর্খ না হইলে এত অধীনতার নির্য্যাতন কখনই সহ্য করিতে পারিত না। পুরুষজাতি আপনাদের ক্ষমতা এক চেটিয়া করিবার জন্যই যে এ সকল নিয়ম সাবধান পূর্ব্বক রক্ষা করিতেন তাহা নিঃসন্দেহ। ইহা দ্বারা পুরুষেরা এক পক্ষে যেমনই হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা হইয়া আপনাদিগের প্রভুত্ব রক্ষা করিয়াছেন, পক্ষান্তরে তাঁহারাই আপনার পায় আপনি কুঠারাঘাত করিতে

ত্রুটী করেন নাই। তাঁহাদের অবিবেচনা হেতু সমস্ত জাতির ও সমস্ত দেশের হীনাবস্থা শতাধিক বৎসরাবধি সমভাবে রহিয়াছে, ইহা কি আক্ষেপের কারণ নহে? স্ত্রীস্বাধীনতা কেবল স্ত্রীজাতির মঙ্গলের কারণ নহে, ইহা সমস্ত সমাজের মঙ্গলের জন্য বলিতে হইবে।

একজন উন্নতমনা জ্ঞানীপুরুষ নানারকমে জগতে গণ্যমান্য ও যশস্বী হইতেছেন, কিন্তু তাহার শরীর ও মনের অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপ স্ত্রী কি না মূর্খ, বিবেচনা শূন্য, তিনি কোন কথায় কোন কার্য্যে সহানুভূতি প্রদান করিতে পারেন না, ইহা কি কখন সুখের বিষয় হইতে পারে? স্ত্রী সকল বিষয়ে পশ্চাৎবর্ত্তিনী হইলে পুরুষ সংসারে একা কোন বিষয়ের সম্পূর্ণ উন্নতি সাধনে সমর্থ হয় না। বুদ্ধিমতা সতী স্ত্রী সকল কাজেই স্বামীর সহায়তা করিতে পারে। অতএব স্ত্রীকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া পুরুষ কখন প্রকৃত উন্নতির রাজ্যে উপনীত হইতে পারে না।

সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া রমণীগণ যে সময় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন সে সময়ে বর্ত্তমান সময়ের মত অবরোধ প্রথা বর্ত্তমান ছিল, এমন কথা কোন পুস্তকে বর্ণিত হয় নাই। তাঁহাদের পরবর্ত্তী কয়েক শতাব্দী যাবৎ এই কুপ্রথার প্রচলন দৃষ্ট হইতেছে। ইহা দ্বারা দেখা যায় নারীজাতি সৃষ্টির প্রথম হইতেই পরাধীনা হইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই এবং নারীজাতি ধর্ম্মে স্বাধীন থাকাতে সংসারে কোন কুদৃষ্টান্ত দেখা যায় নাই, পূর্ব্ব বর্ণিত রমণীগণই তাহার জ্বলন্ত

জাগ্রত দৃষ্টান্ত। স্ত্রীজাতির সঙ্কীর্ণ হৃদয় বলিয়া সময় সময় অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায়। সম্পূর্ণরূপে পরাধীনতাই যে সঙ্কীর্ণতার মূল কারণ তাহার কোন সন্দেহ নাই। যাহাদের সমস্ত মনোযোগ কেবল আপনার ক্ষুদ্র সংসারেই আবদ্ধ, যাহাদের স্নেহ মমতা কেবল আপনার পুত্রেরই জন্য যাহাদের কার্য্যক্ষেত্র গৃহ প্রাঙ্গনকে অতিক্রম করে না তাহাদের অন্তঃকরণ কি প্রকারে প্রশস্ত হইতে পারে। এ প্রকার অনুযোগের কোন ভিত্তি নাই। অন্তরে জ্ঞানালোক প্রকাশ না হইলে সঙ্কীর্ণতা দূর হয় না, তাদৃশ পরাধীনাবস্থায় বদান্যতা প্রকাশ অসম্ভব। যে স্থানে যাবতীয় উচ্চ কার্য্য সকল পুরুষদিগের দ্বারা সম্পন্ন হয় ও নীচ কার্য্য সকল স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য কার্য্য. সে স্থলে স্ত্রীলোকের উন্নতমনা হওয়ার সম্ভাবনা কোথায় ? পুরুষেরা ভাবেন ইহাই উপযুক্ত বিভাগ। ফলতঃ আলো ও অন্ধকারে যে প্রকার বিভিন্নতা, এদেশে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে অবিকল সেইরূপ বিভিন্নতা, ইহাই এ দেশীয়লোকের উন্নতির প্রধান অন্তরায়। পুরুষেরা একটুকু নিঃস্বার্থ ভাবে কার্য্য করিতে পারিলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইহার কার্য্যকারিতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। প্রথম প্রথম স্বাধীন ভাব মনে উপস্থিত হইলে স্ত্রীজাতি তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারিবে ইহা সন্দেহ স্থল, সম্ভবতঃ কিছু দিন ইহার অপব্যবহার হইবেই হইবে। অন্ধকার হইতে একেবারে আলোতে আসিলে যেমন চক্ষে আলো সহ্য হয় না, তাহাদেরও সে প্রকার

হইবে, এবং তাহার উপযুক্ত ব্যবহার করিতে শিক্ষাও সময় সাপেক্ষ, অতএব এজন্য পুরুষদিগের অধৈর্য্য হওয়া উচিত নহে, ক্রমে শিক্ষা লাভ করিলে স্বাধীনতার ফল মধুময় হইবে।

স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সৎশিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। নতুবা স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতারূপে পরিণত হয়। পূর্ব্বকালে স্ত্রীজাতি মূর্খতা ও অজ্ঞতা বশতঃ আপনাদিগের অধিকার সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ ছিলেন। সকল বিষয়ে পুরুষদিগকে উচ্চ অধিকার দিয়া নিজেরা দাসীর ন্যায় অধীনতা স্বীকার করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন, কিন্তু সম্প্রতি সময়ের পরিবর্ত্তন ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে স্ত্রীজাতির জ্ঞান চক্ষু কিয়ৎ পরিমাণে উন্মীলিত হইয়াছে। স্ত্রীজাতির উন্নতি সম্বন্ধে পুরুষদিগের কিঞ্চিৎ দৃষ্টিপাত হওয়াতে ঘরে ঘরে বিদ্যা চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে, স্থানে স্থানে বালিকাবিদ্যালয় ও মহিলা বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে, বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকের বুদ্ধিবৃত্তি প্রখর ও মার্জ্জিত হইতেছে, কুসংস্কার ক্রমে অন্তর্হিত হইতেছে। এখন স্ত্রীলোকেরা পূর্ব্বের ন্যায় আর পরাধীন থাকিতে চায় না, বিদ্যা ও বুদ্ধিতে স্ত্রীজাতি পুরুষদিগের সঙ্গে সমকক্ষতা করিতে অগ্রসর হইতেছে। জ্ঞানালোক তাহাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হওয়াতে আর তাহারা সকল বিষয়ে নিরীহভাবে অন্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে চায় না। স্ত্রীলোকের সাহস বৃদ্ধি হইতেছে এখন স্বাধীনতা ও পরাধীনতার মধ্যে যে প্রভেদ তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিতেছে। ইহা অত্যন্ত আনন্দ ও

গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। ইহা কৃতবিদ্য উন্নতিশীল যুবকদিগের সহৃদয়তার পরিচয় ও তাঁহাদের যত্ন ও অধ্যবসায়ের ফল। তাঁহাদের যত্ন না থাকিলে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হওয়া কঠিন হইত, স্বাধানতা লাভ দূরের কথা। এক সময় স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা প্রচলিত করিবার জন্য শিক্ষিত যুবকদিগকে এত যত্ন ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল যে তাঁহারা কোন বিপদকে বিপদ জ্ঞান করেন নাই। একদিকে হিন্দুসমাজ খড়্গহস্তে দণ্ডায়মান, সুবিধা পাইলেই শিরঃছেদন করিবে, অন্য পক্ষে যুবকবৃন্দ অতুল সাহস ও অধ্যবসায়কে অবলম্বন করিয়া সংগ্রামে প্রস্তুত। তাঁহারা 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন' এই মহাবাক্য সার করিয়া সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া ছিলেন। উপস্থিত সংগ্রামে প্রাণ বিনাশের কারণ উপস্থিত হওয়াতেও তাঁহারা বিমুখ হয়েন নাই। তাঁহাদিগের সেই বীরত্বই বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধানতার সোপান স্বরূপ। নব্য যুবক যুবতীগণ হয় ত সে সকল বিপ্লবের কথা জানেন না। বিনা কষ্টেই এ সকল মহৎ কার্য্য সাধিত হইয়াছে ইহাই তাঁহাদের মনের ধারণা। এই দুরূহ কার্য্য সাধনার্থে এক এক যুবকের প্রাণহানির সম্ভাবনা ঘটিয়াছে, কাহাকেও বা গুরুতর আঘাতে মৃতকল্প হইতে হইয়াছে, তথাপি তাঁহারা লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়েন নাই। ভয়ানক নির্য্যাতন হইতে কত বিধবা কুলকন্যাদিগকে রক্ষা করিয়া তাহাদের জ্ঞানোন্নতি সাধন করিয়াছেন। একারণে অনেকেই গৃহত্যাগী ও পিতৃধনে বঞ্চিত হইয়া একটী পয়সার কাঙ্গালী হইয়া

দ্বারে দ্বারে ফিরিয়াছেন, তথাপি আপনাদের দৃঢ় সংকল্প পরিত্যাগ করেন নাই, তাঁহাদের জ্বলন্ত উৎসাহ কিছুতেই নির্ব্বাপিত হয় নাই, বহুকষ্টে আপনাদের অভিলষিত বিষয়ে সিদ্ধমনোরথ হইয়াছেন। এ জন্য স্ত্রীজাতি মাত্রেই তাঁহাদের নিকট ঋণী। ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাশিক্ষা ও স্বাধীনতার নাম গন্ধও জানিত না। এখন শিক্ষা ও স্বাধীনতা বিষয়ে স্ত্রীজাতি পুরুষের সমকক্ষ হইতেছেন, ইহা কি কম কথা? সে সময় ও এ সময়ের বিষয় ভাবিলে আলো ও অন্ধকারের মধ্যে যেমন পার্থক্য ঠিক তেমন বোধ হয়। বর্ত্তমান সময়ে যুবক যুবতীদিগের জন্য অনেক প্রকার উন্নতি ও সুখের পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে, এমন সুবিধা তাঁহারা হেলায় নষ্ট না করেন ইহাই বাঞ্ছনীয়। সম্প্রতি যুবক যুবতীগণ ন্যায় ও অন্যায়ের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, উন্নতি করিতে গিয়া যেন অবনতি না হয়। স্বর্গের দ্বার উদঘাটন করিতে গিয়া নরকে যেন না ডুবেন, সতর্ক ও সাবধান হওয়ার এই প্রকৃত সময়। যে কার্য্য সাধন করিতে তাঁহাদের পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহদিগের শরীরের রক্ত জল হইয়াছে তাহা অনায়াসলব্ধ বলিয়া তুচ্ছ করা উচিত নহে, ইহার প্রকৃত উন্নতি যাহাতে সাধিত হইতে পারে সে বিষয়ে যত্নপর হওয়া কর্ত্তব্য। স্ত্রীজাতি স্বাধীনতা লাভ করিয়া তাহার উপযুক্ত ব্যবহার করিতে না পারিলে সকল পরিশ্রম বৃথা, ইহা দ্বারা স্বাধীনতা বিরোধী লোকদিগকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করিতে সুবিধা দেওয়া হয় ও সমস্ত দেশের অকল্যাণ

সাধিত হয়। নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় এই স্বাধীনতা পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইতে না হইতে স্থানে স্থানে স্বেচ্ছাচারিতার প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হইতেছে। স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাবারিতা এক কথা নহে। পরাধীনতা যেমন কষ্টকর ও অনিষ্টকারী স্বেচ্ছাচারিতা ততোধিক অমঙ্গল জনক। শিক্ষিত যুবক যুবতীর মধ্যে কেহ এ বিষয়ে ভ্রম প্রমাদে পতিত না হন সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক-তার প্রয়োজন।

সকল কার্য্যে পুরুষদিগের সমকক্ষ হইতে ব্যস্ত হওয়া ও পুরুষ প্রকৃতির অনুকরণ করাই যথার্থ স্বাধীনতার লক্ষণ নহে। ইহা স্ত্রীজাতির প্রকৃতি বিরুদ্ধ। সম্প্রতি উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সকল বিষয়েই পুরুষদিগের সমান হওয়ার অভিলাষ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। স্ত্রীজীবনে উচ্চ শিক্ষা ও কোন মহৎকার্য্য সম্পাদন বিষয়ে কত গুলি বিশেষ বিঘ্ন রহিয়াছে তাহা ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে। প্রথমতঃ স্ত্রীজাতি স্বাভা-বিক দুর্ব্বল, কঠিন পরিশ্রমে অসমর্থ, যাহারা উচ্চ শিক্ষার জন্য কঠিন পরিশ্রম করিতে চায়, তাদের মধ্যে অনেকেই নিত্য রোগী এবং শিরঃপীড়া তাহাদের চির সহচর হয়। কেহ কেহ গুরুতর রোগাক্রান্ত হইয়া পড়াশুনা বন্ধ করিতে বাধ্য হয়, সে দৃষ্টান্ত বিরল নহে। দ্বিতীয়তঃ কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া অতি দীর্ঘকাল জ্ঞানালোচনায় নিযুক্ত থাকা সকলের পক্ষে সহজও নহে উচিতও নহে। সন্তানবতী হইলে নিজের সংসার ধর্ম্ম ও সন্তান পালন এবং সন্তানদিগের সুশিক্ষার জন্য যত্ন

পরিশ্রম করিয়া কোন প্রকার বাহিরের মহৎ ও গুরুতর কার্য্য সাধনের পথ এক প্রকার রুদ্ধ হয়। উচ্চশিক্ষা ও সন্তান পালন উভয়বিধ বিষয় একত্র সাধন করা অতীব কঠিন। উচ্চ শিক্ষা উচ্চশিক্ষা বলিয়া শিশুকাল হইতেই ব্যস্ত থাকিয়া গৃহ কর্ম্ম শিক্ষা প্রায় কাহারো হয় না। যাহারা গৃহকর্ম্মে নিতান্ত অনভ্যস্ত তাহাদের পক্ষে সন্তান পালনও সহজ নহে। এদিকে পুরুষজাতি নিতান্ত রসনাপ্রিয়, প্রাচীনা রমণীগণ শিক্ষিতা হউন আর নাই হউন রন্ধন কার্য্যে বিশেষ পটু ছিলেন, তাঁহাদের হস্তকৃত সুস্বাদু অন্নব্যঞ্জন দ্বারা তাঁহাদের স্বামী, পুত্র ও পৌত্রাদির রসনা সতত তৃপ্ত হইত। বর্ত্তমান কালে যুবকগণ স্ত্রীকে সে সকল বিষয়ে নিতান্ত অপটু দেখিয়া মনে মনে রুষ্ট হইয়া স্ত্রীর পিতামাতার উপর অজস্র গালি বর্ষণে ক্ষান্ত হন না। এজন্য সময় সময় স্ত্রীর গৃহকর্ম্মের অপারগতা ও অপব্যয় সম্বন্ধে অসন্তোষ প্রকাশে বিরত থাকেন না।

যাঁহারা শিশুকাল হইতে কেবল শিক্ষা শিক্ষা করিয়া সাংসারিক কার্য্য সম্বন্ধে নিতান্ত অমনোযোগ দেখাইয়াছেন বিবাহের পর স্বামীর গৃহে কর্ত্রী হইয়া তাঁহাদিগকে নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া পড়িতে হইয়াছে। দাস দাসীগণ গৃহ কর্ত্রীকে অনভিজ্ঞ বুঝিয়া সময় ও সুবিধা মতে আপনাদের স্বার্থ সাধনের ক্রটি করে না। নবীনা গৃহিণী মনে করেন দাস দাসীগণ অতিশয় বিশ্বাসী, তাহারা কখনও চুরি করে না। নিত্য প্রয়োজনীয় গৃহ সামগ্রীর দর দাম সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা না থাকাতে ভৃত্যগণ

যাহা করে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন। কতগুলি অর্থ ব্যয় হইয়া যদি নিজে নিশ্চিন্তভাবে নভেল নাটক পড়িতে পারেন তাহাই পরম লাভ মনে করেন। তাহাদের নূতন জীবন আরম্ভ হয় সুতরাং বর্ত্তমান ভিন্ন ভবিষ্যৎ ভাবিতে জানেন না; কোনপ্রকার নিজের সুখের ত্রুটি না হইলেই হইল, তাঁহারা স্বামী ও পুত্রের ভবিষ্যৎ জীবনের ভাবনা ভাবিতে জানেন না। অর্থোপার্জ্জনে পুরুষের মাথার ঘাম পায়ে পড়ে, স্ত্রীর অনবধানতা বশতঃ সেই অর্থের অপব্যয় দেখিলে অনেক পুরুষেরই অসহ্য হইয়া উঠে। একারণ গৃহ বিবাদ উপস্থিত হইয়া দম্পতির শান্তি নষ্ট করে। বিবাহের পর স্ত্রীলোকের উচ্চ শিক্ষা ও অশিক্ষার বড় বেশী তারতম্য থাকে না, কারণ সংসারে প্রবেশ করিয়া পুত্র কন্যার মা হইলে সাধারণ মাতাদের সঙ্গে বি, এ এম, এ পাশ মাতার বিশেষ কোন প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের জন্য বিদ্যাশিক্ষা করিয়া শরীর নষ্ট না করিয়া কেবল জ্ঞানোপার্জ্জন ও গৃহ কর্ম্ম শিশুপালন প্রভৃতির জন্য শিক্ষা করিতে পারিলে অধিকতর মঙ্গলের কারণ হয়। সংসারে স্ত্রী ও পুরুষের কার্য্যক্ষেত্র সম্পূর্ণ পৃথক। কারণ পরস্পরের দেহ, মন ও কার্য্য ক্ষমতা সবই বিভিন্ন। কি কারণে এ সকল নির্দ্ধারিত হইয়াছে সে বিষয় স্থির চিত্তে একবার না ভাবিয়া বামনের আকাশে চাঁদ ধরার ন্যায় কেবল উর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ মঙ্গল জনক নহে। উচ্চ শিক্ষা শিক্ষা করিয়া অনেকেরই এই স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, সুতরাং তাহারা যেমন উচ্চ কাজের অনুপযুক্ত

হয় তেমন আবার সুগৃহিণী ও সুমাতা নামেরও উপযুক্ত হইতে পারে না। স্ত্রীলোকের উপার্জ্জনেচ্ছা হইতে এই অনিষ্ট সংগঠন হইতেছে, কেবল শিক্ষার জন্য শিক্ষালাভ করিয়া কেহই সন্তুষ্ট নহে। আজকাল পুরুষেরা কি এতই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে যে আপনাদের উপার্জ্জন দ্বারা পরিবার প্রতিপালন করিতে পারে না। স্ত্রীলোক অর্থোপার্জ্জন ও সন্তানপালন উভয় কার্য্যই সম্পাদন করিবে, ইহা অতিরিক্ত আশা। ইহা-দ্বারা স্ত্রীজাতি অল্পায়ু ও রুগ্ন সন্তান প্রসবিনী হইয়া পরিবারের কষ্ট বর্দ্ধন করিবে এবং এইরূপে সমস্ত জাতির ধ্বংসের কারণ হইবে। অতএব এ প্রকার শিক্ষা বিশেষ মঙ্গল জনক বলিয়া বোধ হয় না। ইহা দ্বারা স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা অনিষ্টের কারণ বলা যাইতেছে না। বিদ্যাশিক্ষা অত্যন্ত আবশ্যক, বিদ্যা ভিন্ন জ্ঞানের বিকাশ হয় না কুসংস্কার ও মনোমালিন্য দূর হয় না, কর্ত্তব্যজ্ঞান উজ্জ্বল হয় না। এ কথা পূর্ব্বেই বিশদরূপে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছি। উচ্চশিক্ষা হউক আর না হউক সকল বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান লাভ করিবার শিক্ষা নিতান্তই আবশ্যক। শিক্ষা ভিন্ন বুদ্ধির মার্জ্জনা হয় না, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অগোচর ও অসাধ্য কিছু নাই। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মজ্ঞান ও হিতাহিত বিবেচনা শক্তির পরিমার্জ্জনা নিতান্ত আবশ্যক। মনুষ্য ধর্ম্মবল ভিন্ন সংসারের ভয়ানক প্রলোভন রাশির মধ্যে অটল ভাবে থাকিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে না। ধর্ম্মের বন্ধন যেমন দৃঢ় তেমন আর কিছুই নহে।

যাহার হৃদয়ে ধর্ম্মভাব প্রবল পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, সেস্থলে স্বাধীনতা মধুময় ফল প্রদান করে। একমাত্র ধর্ম্মভাবের অভাবে স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতা রূপে পরিণত হয়।

পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোকেরা অন্তঃপুরে বদ্ধ থাকাতে অন্য পুরুষদিগের সহিত কোন সংস্রব থাকিত না। এখন স্ত্রী পুরুষ সর্ব্বদাই একত্র থাকিয়া নানা বিষয়ের আলোচনা গল্প ও আমোদ করে, ইহা কেবল বিলাত ফেরতদিগের সম্বন্ধে বলা যাইতেছে না দেশীয়দিগের মধ্যে ইহা আরও অধিক প্রবল। বিলাত ফেরতদিগের শিক্ষা ও অর্থ সচ্ছলতা বশতঃ তবুও কতকটা নিয়ম রক্ষা হয়, কিন্তু উপযুক্ত অর্থাভাবে দেশীয় দিগের সকলের পক্ষে তাহা হওয়া কঠিন। ইংরাজী নিয়মানুসারে ভাল পোষাক না করিয়া কেহ স্ত্রীলোকের সম্মুখে যায় না, যে সে শয়ন গৃহে যায় না কিন্তু বর্ত্তমান সভ্য সমাজে তাহার বিপরীত দেখা যাইতেছে। এক গৃহে শয্যা পাতিয়া পরিবারস্থ সমস্ত লোক শোয়া বসা ও তাস পাসা খেলা করে, বাহিরের লোক যে যখন আসে সকলেরই সেইটা বসিবার স্থান। এ সব ব্যবহার অতীব দূষণীয়, ইহাদ্বারা স্ত্রীলোকদিগের স্বাভাবিক লজ্জা কমিয়া যায়, প্রগল্‌ভতা বৃদ্ধি পায়, ঠাট্টা তামাসা করিবার অভ্যাস বাড়ে। ইহা ভিন্ন সময় সময় নানা প্রকার দোষ ও অনিষ্ট সংগঠন হয়। সকল দেশ ও সকল সমাজেই কতগুলি পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন রহিয়াছে।

বর্ত্তমান নব্যসমাজ এখনও গঠিত হয় নাই, ইহার ভিত্তি এখনও দৃঢ় হয় নাই। অনেকেই পূর্ব্ব সমস্ত নিয়ম পরিত্যাগ করা ও নূতন নিয়ম অবলম্বন করাকেই প্রকৃত স্বাধীনতা মনে করেন। প্রকৃত স্বাধীনতা কি ও তাহা কিসে রক্ষা হয় সে বিষয়ে অনেকেই নিতান্ত অনভিজ্ঞ। যদৃচ্ছাক্রমে যার তার সঙ্গে যথা তথা গমনাগমন করিতে পারিলেই স্বাধীনতা হয় না। স্ত্রী ও পুরুষ নিয়ত একত্র থাকিয়া গল্প আমোদে দিন কাটাইতে পারিলেই প্রকৃত স্বাধীনতা রক্ষা হয় না। পিতা মাতা ও অন্যান্য বয়ঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের কথার অবাধ্য হইয়া তাহাদের প্রতি অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করাকেও স্বাধীনতা বলে না, এ সকল কেবল উদ্ধত প্রকৃতির লক্ষণ। অন্যায় ও পাপ কার্য্য সকল দৃঢ়তার সহিত পরিত্যাগ করিতে পারিলেই স্বাধীনতা রক্ষা হয়। প্রত্যেক সমাজেই এ সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ নিয়ম নিবদ্ধ হওয়া উচিত। স্বাধীনতারও একটা সীমা চাই, স্বাধীন হইলেই কোন প্রকার নিয়ম শৃঙ্খলা না মানিয়া যাহা প্রাণ চায় তাহাই করা যদি স্বাধীনতার অর্থ হয় তবে শীঘ্রই সে সমাজের অধঃপতন হইবে। এ সকল উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারে সমাজের উন্নতির পরিবর্ত্তে অবনতি ও শোচনীয় অবস্থা আনয়ন করিবে। অতএব ইহার মূলে কৃতবিদ্য, কর্ত্তব্য-জ্ঞান-সম্পন্ন, বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ দণ্ডায়মান না হইলে প্রকৃত মঙ্গলের আশা নাই। এখন এ বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলে পরে অনুতপ্ত হইতে হইবে।

আলস্য বাঙ্গালী জাতির মুখ্য দোষ তাহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। অধিকাংশ লোকই আলস্য পরবশ হইয়া শারীরিক পরিশ্রমে অপটু, বিনা পরিশ্রমে শুইয়া বসিয়া দিন কাটানই যথার্থ সুখ মনে করে। যদি কাহারও অর্থ সচ্ছলতা থাকে, অঙ্গ মর্দ্দন ও বেশ বিন্যাসের জন্য দশটী দাস দাসী নিযুক্ত থাকে, তাহারা যে ভাবে দিন কাটায় তাহা চিন্তা করিলে কষ্ট অনুভব হয়। এমতাবস্থায় স্বাধীনভাব কি প্রকারে হৃদয়ে স্থান পাইবে। ধনী সন্তানগণ পিতৃদত্ত অসীম ধনের অধিকারী হইয়া যদি অপব্যয়ে সে সকল নিঃশেষিত করেন, তাহা হইলে তাহাদিগকে স্বেচ্ছাচারী ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে। আমাদের দেশে অধিকাংশ পিতামাতাই, সৎকার্য্যে নিষ্ঠা ও দান ধ্যান হইতে বিরত থাকিয়া, কায় ক্লেশে জীবন যাপন পূর্ব্বক সন্তানের জন্য অর্থ রাশি সঞ্চয় করিয়া যায়, তন্মধ্যে অনেক সন্তান দুর্ব্বৃত্ত, অহঙ্কারী, অপরিমিতব্যয়ী ও মদ্যপায়ী হইয়া পিতার সমস্ত জীবনের কষ্ট সাধ্য অর্থরাশি অল্পদিন মধ্যেই অসৎ ও অন্যায় কার্য্যে ব্যয় করিয়া রিক্ত হস্ত হইয়া পড়ে, তখন তাহার কষ্টের সীমা থাকে না। এ প্রকার অর্থ সন্তানের মঙ্গলসাধন না করিয়া বরং অমঙ্গলের কারণ হয়। এত অর্থ না থাকিলে সম্ভবতঃ পুত্র বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া অর্থ লাভের চেষ্টা করিত, বিদ্যাদ্বারা মূর্খতা দূর হইলে সৎপথের পথিক হইতে পারিত। এদেশে ধনীলোকেরা নিজের সন্তান না থাকিলে পোষ্যপুত্র লইয়া তাহাকে সম্পত্তির অধিকারী

করিয়া যায় তথাপি সৎকার্য্যে সম্পত্তি দান করিতে কাহারও ইচ্ছা হয় না। পরিবারের উন্নতির জন্যই লোক ব্যস্ত, সমাজের মঙ্গলের দিকে কাহারো দৃষ্টি নাই। ইংরেজ জাতির দোষ সকল আমরা সহজেই গ্রহণ করিয়া থাকি কিন্তু তাহাদের গুণ সকল গ্রহণ করিতে আমাদের তেমন যত্ন কোথায়? তাহারা শৈশবকালে বিদ্যাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা শিক্ষা করে। কায়িক পরিশ্রম দ্বারা পরিবার প্রতিপালন করিতে হইবে, কাহারো নিকট প্রাণান্তেও যাচ্ঞা করিব না, পর প্রত্যাশী হইব না, তাহা দ্বারা মানের হানি হয় এই জ্ঞান তাহাদের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধিত হয়। এজন্য তাহারা স্বাধীন না হইয়া, পরিবার রক্ষণোপযোগী অর্থ সঞ্চয় না করিয়া বিবাহ করে না। এ বিষয়ে পিতামাতা ও আত্মীয়ের নিকট কোন সাহায্যের প্রত্যাশা করে না। বিবাহান্তে স্ত্রীর সমুদয় ব্যয় ভার নিজে বহন করে, শ্বশুরের নিকট কিছু আশা করে না। এ দেশীয় যুবকগণ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহারা শ্বশুরের নিকট হইতে স্কুল খরচ জন্য সামান্য অর্থ সাহায্যের আশায় বিবাহ করিয়া থাকে। কিন্তু শ্বশুর প্রদত্ত অর্থদ্বারা কাহারো বিশেষ কোন উপকার হইতে দেখা যায় না; স্কুল খরচের জন্য যাহা কিছু অর্থ পাওয়া যায় তাহা দ্বারা অনেক সময় নিজের খরচই চলে না, তাহাতে আবার স্ত্রীর ব্যয়ভার বহন করিতে হয়। কেহ কেহ বা অচিরেই সন্তানের পিতা হইয়া পড়ে, এইরূপে ক্রমেই পরিবার বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং

নানাপ্রকার সাংসারিক বাধা বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। যে কারণেই হউক বিদ্যাশিক্ষার অনেক বাধা জন্মে। অনেকেই পড়া শুনা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা পর্য্যন্ত পাশ না করিয়াই কার্য্যান্বেষণে বাহির হয়। যেমন বিদ্যা তেমন ফল; অধিকাংশ যুবকদেরই অহর্নিশি খাটিয়া যৎসামান্য বেতনলাভ হয়, তদ্দ্বারা পরিবার পালন একেবারে দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। যাহা কিছু পৈতৃক সম্পত্তি থাকে তাহা নিঃশেষিত হইয়া পরিবারের অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়। তখন চতুর্দ্দিক অন্ধকার জ্ঞান হয়, উপায় বিহীন হইয়া পরের নিকট যাচ্ঞা করিতে বাধ্য হয়। কেহ কেহ এজন্য চুরি কপটতা ও মিথ্যা প্রবঞ্চনার আশ্রয় গ্রহণ করে। দুঃখের বিষয় এই, ঘরে ঘরে এ সব দৃষ্টান্ত দেখিয়া কাহারও চৈতন্য হইতেছে না ও ইহার প্রতিবিধানে কোন যত্ন লক্ষিত হইতেছে না। যদি যুবকগণের মনে বিন্দুমাত্র স্বাধীনতার ও মনুষ্যত্বের ভাব থাকিত তবে এ প্রকার শোচনীয় অবস্থা কখন ঘটিত না, তাহারা সকল প্রকার বাধা বিঘ্নকে অতিক্রম করিয়া সর্ব্বাগ্রে বিদ্যাশিক্ষা করিত এবং উপযুক্ত অর্থ সঞ্চয় করিয়া বিবাহ করিত, তাহা হইলে এপ্রকার লাঞ্ছনা ভোগ কখন হইত না। সন্তানের বিবাহ সম্বন্ধে এ দেশীয় পিতামাতাগণ নির্দ্দোষী নহেন। সন্তান উপার্জ্জন ক্ষম হউক আর না হউক, কি প্রকারে পরিবার পালন করিবে তাহার কোন ব্যবস্থা নাই থাকুক, এমতাবস্থায়ই বিশেষ আগ্রহ সহকারে পুত্রের বিবাহ দিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন ঈশ্বর

যখন মুখ দিয়াছেন তখন আহার যোগাইবেনই। দুঃখের বিষয় তাহাদের এই অন্ধ বিশ্বাস সন্তানের মঙ্গলের কারণ না হইয়া অনেক সময় কষ্ট আনয়ন করে। যদি কোন বুদ্ধিমান ছেলে বিবাহে অসম্মতি প্রদর্শন করে তখন পিতামাতার কষ্টের সীমা থাকে না। এ বিষয়ে তাহারা যে নিতান্ত ভ্রমান্ধ বলা বাহুল্য। এ কারণে অনেক যুবা পিতামাতার আগ্রহে এবং নিজের দৃঢ়তা ও স্বাধীনভাবের অভাবে বিষম ভ্রম প্রমাদে পতিত হইয়া ভাবী জীবনের উন্নতি পথে কণ্টক রোপণ করে।

এদেশে জাত্যভিমান প্রথা প্রচলিত থাকাতে এ সম্বন্ধে আরও অমঙ্গল ঘটিতেছে। যথা সময়ে কন্যার বিবাহ দিতে না পারিলে পিতাকে জাতি ভ্রষ্ট হইতে হয়। এজন্য তাহারা বালকদিগের উপযুক্ত বয়স হইতে না হইতে, শিক্ষা সমাপ্ত হইতে না হইতে নানা প্রকার যত্ন ও প্রলোভন দ্বারা বালকের পিতামাতাকে বশীভূত করে। এদেশের অধিকাংশ লোকই দরিদ্রাবস্থাপন্ন সুতরাং সামান্য অর্থ লোভ সংবরণে অসমর্থ হইয়া হিত ভাবিয়া পুত্রের অহিত সাধন করিয়া থাকেন। জাতি রক্ষার জন্য অথবা স্বার্থান্ধ হইয়া পিতামাতা এ প্রকার কার্য্য করেন, ইহা যুবকদিগের অবনতির অন্যতর কারণ। আমাদের দেশীয় লোকের যেমন স্বাধীন ভাবের অভাব তেমন সাহস ও অধ্যবসায়ের ত্রুটি দেখা যায়। নিবিষ্ট চিত্তে দৃঢ়ভাবে কোন কার্য্য সাধন করা এক প্রকার স্বভাব বিরুদ্ধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কোন প্রকার কারবার কিম্বা

বাণিজ্য ব্যবসায় প্রভৃতি যে কোন কার্য্যই হউক না কেন প্রথম প্রথম জ্বলন্ত উৎসাহের সহিত আরম্ভ করে, কয়েক বৎসর বেশ চলে, তারপর ক্রমে উৎসাহ কমিয়া যায়।

উপযুক্ত শাসন ও রক্ষণাভাবে অচিরেই ব্যবসায় বন্দ হয় সুতরাং লাভের বাণিজ্য লোকসানে পরিণত হয়। এজন্য ঋণগ্রস্ত হইয়া অনেকেই কষ্ট পায়। কেহ কেহ মিথ্যাছল চাতুরী করিয়া দেউলিয়া নাম গ্রহণ পূর্ব্বক অংশীদার ও অন্যান্য উত্তমর্ণদিগের সর্ব্বনাশ করে। এ প্রকার ব্যবহার যে নিতান্ত নীচাশয়ের কার্য্য সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ব্যবসায় ও বাণিজ্য সম্বন্ধে ইংরেজ জাতির অনুকরণ করিতে পারিলে এদেশীয়দিগের বরং কতকটা উন্নতির সম্ভাবনা ছিল। মদ্য পানকে অনেকে ইংরেজদিগের অনুকরণ ও স্বাধীনতার লক্ষণ মনে করে। ইংলণ্ড শীতপ্রধান দেশ, ইংরেজ সে দেশের লোক, সে দেশে কিয়ৎ পরিমাণে মদ্যপান তত অনিষ্টজনক হয় না। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সে দেশেও অনেক লোক মদ্য-পান একবারেই অনাবশ্যক মনে করেন। তাহারা যে পরিমাণ সুরা পান করিয়া স্থৈর্য্য রক্ষা করিতে পারে, এই গ্রীষ্ম প্রধান দেশের লোকেরা তাহার অর্দ্ধেক কিম্বা চতুর্থাংশ পান করিয়াও আপনার স্থিরতা রক্ষা করিতে পারে না ; এমন কি পশুবৎ ব্যবহার দ্বারা জনসমাজে ঘৃণার্হ ও হাস্যাস্পদ হইয়া থাকে। এ দেশীয় লোক সাধারণতঃ দরিদ্র, অনেকেরই পরিবার পালনোপযোগী অর্থ পর্য্যন্ত নাই, তাহাতে একবার মদ্যপান

অভ্যাস হইলে পরিবারের লোক অনাহারে মরিলেও মদ্য পানের ব্যয় সংকোচ করা যায় না। এমতাবস্থায় মানুষ পশু-তুল্য হয়। এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অতিরিক্ত সুরাপান করিলে প্লীহা যকৃৎ নিশ্চয়ই হয়। কেহ কেহ এসকল রোগের হাত হইতে কখন নিষ্কৃতি লাভ করিতে না পারিয়া অচিরেই কালের করাল কবলে পতিত হয়। মদ্যপান দ্বারা অপকার ভিন্ন উপকার হয় আজ পর্য্যন্ত একথা শুনা যায় নাই। অবশ্য পীড়িতাবস্থায় ডাক্তারের বিধিমতে যৎকিঞ্চিৎ পান করিলে অনিষ্ট হয় না, অতিরিক্ত মদ্যপানই সর্ব্বদাই অনিষ্টকারী। মদ্যপানের সুখ মাতাল ভিন্ন অন্যলোকে অনুভব করিতে পারে না। ইহাতে সুখ যতদূর হউক আর না হউক একবার অভ্যাস হইলে পরিত্যাগ করা অতীব কঠিন। মাতালের দুরবস্থা অনেকেই স্বচক্ষে দেখিয়াছেন অতএব তাহার বিস্তৃত বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। ইংরেজ জাতির স্ত্রী পুরুষ সকলের মধ্যেই মদ্যপান প্রথা সমভাবে প্রচলিত। কিন্তু তাহাদের সহিত সকল বিষয়ে এদেশীয় দিগের ঐক্য হয় না। যে পরিমাণে মদ্যপান দ্বারা তাহারা ধীর থাকিয়া নিয়মিত কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে, এদেশীয়েরা তদপেক্ষা অল্পপরিমাণ পান করিলেই ধৈর্য্য হারায়, তদবস্থায় তাহাদের সম্মুখীন হইতে লোকে ভয় পায়। ফলতঃ তখন পশুর সহিত তাহাদের কোন প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। মদ্যপান আরম্ভ করিলে এদেশীয়দিগের তাহার মাত্রা ঠিক থাকে না, সর্ব্বদাই ইহার বিপরীত ফল ফলে।

আমাদের দেশীয় পুরুষদিগের কথা দূরে থাকুক, যে সমস্ত মহিলা বিলাত ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ এই দুর্নীতির অনুকরণ করিতে ক্রুটী করে নাই, ইহা অপেক্ষা ঘৃণা, লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে ? অবশ্য স্বামীদিগের অন্যায় উৎসাহদানই তাহার মূলীভূত কারণ; কেন না ডিনার টেবিলে ইংরেজদিগের সঙ্গে আহার করিতে বসিয়া মদ্যপানে অস্বীকার করাকে তাহারা অভদ্রতা মনে করেন। ইহাও যে একটা কর্ত্তব্য জ্ঞান ও দৃঢ়তার অভাব তাহা বলা বাহুল্য। সত্য বটে তাঁহারাই ইংরেজী সভ্যতার সোপানে প্রথম আরোহণ করিয়াছিলেন, প্রথম প্রথম সকল বিষয়েই ভুল হয়। ভরসা করি নব্যযুবক যুবতীগণ আর সে প্রকার ভ্রম প্রমাদে পতিত হইবেন না। মদ্যপান যে নিতান্ত বিগর্হিত কর্ম্ম তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকে; যাহাতে এ দেশীয় স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে এ কুব্যবহার প্রশ্রয় না পায় সে বিষয়ে শিক্ষিত যুবক যুবতী মাত্রেরই চেষ্টা করা উচিত। স্বাধীন হইলেই যাহা ইচ্ছা করা, সকল জাতির ভাল মন্দ আচরণের বিষয় চিন্তা না করিয়া গ্রহণ করা, সবলের ভয়ে ভীত, দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার এ সকল অবিবেকতা ও কাপুরুষতার লক্ষণ, ইহাকে স্বাধীনতা বলা অন্যায়। অসভ্য জাতি সকল দেশেই স্বাধীন, তাহাদের আচার ব্যবহার সকল প্রকার বন্ধন হীন। এ দেশের অহিন্দু নিম্নশ্রেণীর লোকেরা সকলেই স্বাধীন, স্ত্রী পুরুষ সমভাবে হাটে বাজারে যায়, সম-

ভাবে কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করে এজন্য তাহারাই সুখী ইহা মনে করা অন্যায়। ন্যায় অন্যায় বিচার শক্তি সমুজ্জ্বল না হইলে স্বাধীনতার বিশুদ্ধ সুখ সম্ভোগ করা যায় না। স্বেচ্ছাচারিতার সঙ্গে একেবারে সংস্রব না থাকাকেই প্রকৃত স্বাধীনতা বলা উচিত। ঈশ্বর মনুষ্যকে প্রাণী মণ্ডলীর মধ্যে যেমন স্বাধীন শ্রেষ্ঠ জীব করিয়া সৃজন করিয়াছেন তেমন স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করিবার ক্ষমতাও প্রদান করিয়াছেন; সেই ক্ষমতার অপব্যবহার হওয়া অত্যন্ত ক্ষোভের কারণ। স্বাধীনতা লাভেচ্ছা মনুষ্যের স্বাভাবিক তাহা ভিন্ন কেহই সুখী হয় না। স্বাধীনতাহীন স্বর্ণ পিঞ্জরাবদ্ধ পাখী পর্য্যন্ত সুখী হয় না, অতএব এ ইচ্ছা পশু পক্ষী প্রাণী মণ্ডলীকেও অতিক্রম করে নাই। এ সংসারে কেবল স্বাধীন হইয়াই লোক কখন সুখী হইতে পারে না। সময় সময় অধীনতাও প্রকৃত সুখকর বটে। প্রেমই ইহার মূল। এই প্রেম দ্বারা পরমেশ্বর জগৎ শাসন করেন, মনুষ্য তাহার ছায়া মাত্র। পতি পত্নী পরস্পর প্রেমাধীন, সন্তান সন্ততি পিতামাতার স্নেহাধীন পিতামাতাও যে সন্তানের অধীন নহে তাহা বলা যায় না, পিতামাতাও সন্তানের ভক্তি শ্রদ্ধায় বশীভূত হয়, তাহাদের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইতেও কুণ্ঠিত হয় না, ইহা কি সামান্য অধীনতা? এ জগতে সকলেই কোন না কোনও প্রকারে পরস্পরের অধীনতা স্বীকার করে, তাহা অনিচ্ছা পূর্ব্বক নহে, ভক্তি প্রীতি, স্নেহ দয়া প্রভৃতিই পরস্পরের উপর কার্য্য করে। এ প্রকার অধীনতা কষ্টের

কারণ নহে বরং সুখের কারণ। ইহাতে স্বাধীনতা নষ্ট হয় না। পিতামাতার অবাধ্য হইয়া তাহাদের আজ্ঞা পালন না করাতে পুত্র কন্যার স্বাধীনতা প্রকাশ পায় না, স্বামী স্ত্রী পরস্পরের অবাধ্য হইয়া প্রেমবন্ধন ছিন্ন করিলে প্রকৃত স্বাধীনতা রক্ষা হয় না। দুর্ব্বলের প্রতি বল প্রকাশে স্বাধীনতার মহত্ব রক্ষা হয় না। এ সকল স্বাধীনতা নহে উদ্ধত প্রকৃতির কার্য্য।

মনুষ্য মাত্রেরই স্বাধীন হওয়ার ইচ্ছা এক প্রকার স্বাভাবিক, কিন্তু সেই ইচ্ছা সর্ব্বত্র সমভাবে কার্য্য করে না, অনেকের দুর্ব্বলতা কিংবা আর্থিক অসচ্ছলতা বশতঃ অধীনতা স্বীকার অনিবার্য্য হয়। কিন্তু যখন যে অবস্থাই হউক না কেন মনু-ষ্যের সৎসাহস দৃঢ়তা ও কার্য্যক্ষমতা থাকিলে স্বাধীনতা রক্ষা হয়। আলস্য পরবশ হইয়া শুইয়া বসিয়া কেহ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে না। যে স্বাধীনতা দ্বারা লোক বিপথগামী হয়, যে স্বাধীনতা নিরীহ দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার বৃদ্ধি করে, যে স্বাধীনতা ধর্ম্মপথের কণ্টক হয় ও পাপের স্রোত বৃদ্ধি করে সে স্বাধীনতা স্বাধীনতাই নহে। কেবল আপন ইচ্ছামত কার্য্য করাকে স্বাধীনতা বলে না। যাবতীয় অন্যায় কার্য্য সকল পরিত্যাগ করিতে পারিলেই যথার্থ স্বাধীনতা রক্ষা হয়। কেবল নীচ প্রকৃতির লোকেরাই অন্যায় কার্য্য সকল আপন ইচ্ছামত সম্পাদন করিয়া শ্লাঘা মনে করে ও স্বাধীন বলিয়া লোকের নিকট অহঙ্কার করিতে ভাল বাসে; কিন্তু ইহা দ্বারা তাহারা লোকের নিকট নিশ্চয় হাস্যাস্পদ হয়। অতএব

যথার্থ স্বাধীনতা রক্ষা কেবল কথার কথা নহে। আমার মতে উপরিউক্ত নিয়ম সকল রক্ষা করিতে পারিলেই যথার্থ স্বাধীনতা রক্ষা হইতে পারে।

স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বকালে এ দেশে স্ত্রীলোকের লেখাপড়ার চর্চ্চা ছিল না, সুতরাং বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য কোন যত্ন ছিল না এবং কেহ তাহার আবশ্যকতাও অনুভব করিত না। বালিকাগণ যদৃচ্ছাক্রমে খেলায় ধূলায় দিন কাটাইত। বর্ত্তমান সময়ে সে সকল ভাব চলিয়া গিয়াছে, এখন ছেলেদের ন্যায় পঞ্চমবর্ষ গত হইতে না হইতেই মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়।

হিন্দুঘরে ১০।১২ বৎসরের মধ্যেই বালিকাদিগের বিবাহ হইয়া যায়, ইতি মধ্যে বালিকাদিগকে যথাসাধ্য বিদ্যাভ্যাস করান হয়। ইহাদ্বারা দেখা যায় প্রাচীন লোকেরাও বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতাও উপকারিতা বুঝিতে পারিয়াছেন, ইহা অত্যন্ত সুখের বিষয়। পুরাতন সমাজই হউক আর নব্যসমাজই হউক, বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত সকলেই অনায়াসে শিক্ষা লাভ করিতে পারে। অতএব এ সময়টা বৃথা গল্প আমোদে না কাটাইয়া আবশ্যক মত সকল প্রকার শিক্ষা লাভ করা কর্ত্তব্য। পুরুষদিগের ন্যায় চিরদিন শিক্ষার সময় ও

আদর্শ হওয়া কর্ত্তব্য। গৃহস্বামীর পবিত্র জীবন স্ত্রী পুত্র কন্যা সকলেরই অনুকরণীয়; দাসদাসী পর্য্যন্ত ইহার অনুকরণ করিয়া থাকে। প্রত্যেক গৃহে আপনাপন বিশ্বাসানুযায়ী ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ঈশ্বরের পূজা হওয়া কর্ত্তব্য। শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেরই মনে এই ধ্রুব বাক্য নিহিত থাকা উচিত যে আমরা কেবল ইন্দ্রিয়ের সেবা করিতে এ সংসারে আসি নাই এতদাপেক্ষা আমাদের আরও কিছু উচ্চ উদ্দেশ্য ও উচ্চ কার্য্য করণীয় রহিয়াছে। সংসারের খাওয়া পরা ভিন্ন আরও অধিক কর্ত্তব্য কার্য্য আছে। কেবল সংসারে নিরন্তর মুগ্ধ থাকিয়া সেই মহৎ লক্ষ্য ভুলিয়া যাওয়া অন্যায়। মনুষ্যের মন কেবল বিষয় সুখে তৃপ্ত হয় না।

ধর্ম্মজ্ঞান ও সাধু ইচ্ছা মানুষের অন্তরেই নিহিত থাকে সংসারের স্রোতে পড়িয়া ইহা কখন কোন পথ অবলম্বন করে বলা যায় না। যতদিন ইন্দ্রিয় সকল সতেজ থাকে ততদিন মনুষ্যের প্রকৃতি অধিকতর চঞ্চল থাকে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাব দূর হয় তখন মনুষ্যের আত্মচিন্তা ও পরলোকের ভাব মনে জাগ্রত হয়। এ সংসারে সকলেই জানে কেহই চিরদিন এখানে থাকিবে না, তবু এ চিন্তা ক্ষণকাল মধ্যে সংসারে ডুবিয়া যায়। বার্দ্ধক্যে এ সকল ভাব অন্তরে স্থিতি করে, পরকাল নিকটবর্ত্তী মনে হয়। কিন্তু চিরজীবন পাপ করিয়া কেবল বৃদ্ধকালের অনুতাপে কি কখন এত পাপ ক্ষয় হইতে পারে? শিশুকাল হইতেই পূণ্য সঞ্চয়ের অভ্যাস চাই

নতুবা বৃদ্ধকালের আশায় থাকিয়া আপনাপন কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইলে শেষ জীবন অন্ধকারাবৃত হয়। সদালাপ, সদ্ব্যবহার, ও সদ্দৃষ্টান্ত এই তিনটীই সাধু জীবনের কার্য্য অতএব ইহার অনুকরণ করাকেই আদর্শ গ্রহণ বলে।

সৎগৃহস্বামী ও গৃহিণীই সংসারের উচ্চ আদর্শ, এতদাপেক্ষা জাগ্রত দৃষ্টান্ত আর কোথায় পাওয়া যায়? গার্হস্থ জীবনের সমুদয় সুখ দুঃখ ইহার উপর নির্ভর করে। জীবনের যাবতীয় কর্ত্তব্য সকল সম্পূর্ণ রূপ পালন করিতে পারিলেই গার্হস্থ জীবনের আদর্শ রক্ষা হয়। এই সংসারের বিবিধ প্রকার কর্ত্তব্যের মধ্যে যাঁহার আত্মা দিগ্ নির্ণয় যন্ত্রের কাঁটার ন্যায় নিরন্তর ঠিক লক্ষ্য-মুখীন থাকিতে সমর্থ হয় তিনিই অবশেষে পরম পবিত্রতা লাভ করিয়া বিমল আনন্দ অনুভব করেন এবং ইহকালে অপার শান্তি ও পরকালে অক্ষয় পুণ্যের অধিকারী হন। এই প্রকার আদর্শ সংসারীই জীবনে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা মঙ্গল বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া ধন্য হইয়া থাকেন।

সমাপ্ত।

SP 4/45

LIBRARY
AUG 1903